Banglapdf.net

কোরআনের আলোকে

নাস্তিকের মনস্তত্ত্ব

এস এম জাকির হুসাইন

AKAS

SUVOM

কোরআনের আলোকে

নাস্তিকের মনস্তত্ত্ব

এস.এম. জাকির হুসাইন

জ্ঞান কোষ

জ্ঞানকোষ প্রকাশনী

বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রকাশক:
জ্ঞানকোষ প্রকাশনী ৩৮/২-ক
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
ফোন ৭১১৮৪৪৩, ০১৭১২৭১৭১৮

গ্রন্থস্বত্ব:
আবেদা সুলতানা

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৬, একুশে বই মেলা
পুন মুদ্রন : ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রচ্ছদ:
বাপ্পি আশরাফ

বর্ণসজ্জা:
রিয়াজুল ইসলাম (রিয়াজ)
এস.এস.পাবলিসার্স
ঢাকা।

ISBN : 978-984-8933-80-0
মূল্য ৮০ টাকা মাত্র।

উৎসর্গ:

নূর আলম হাওলাদার (ঢাকা)

এই বইয়ের মাধ্যমে যদি কোনো পুণ্য অর্জিত হয়, তাহলে আল্লাহ তা তোমাকে দান করুন। আমীন!

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শুভম
স্ক্যানিং এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

লেখকের অন্যান্য বই:

আমেরিকা থেকে প্রকাশিত:

Secret Death and New Life

[www.amazon.com এ পাওয়া যাচ্ছে। লেখক বা বইয়ের নাম ধ'রে search করুন।]

বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত:

ধ্যানের শক্তি ও নবজীবন

গোপন মৃত্যু ও নবজীবন (১ম ও ২য় খণ্ড)

ধ্বংসাত্মক ধ্যান

অন্ধকারের বস্ত্রহরণ (১ম ও ২য় খণ্ড): বৈজ্ঞানিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সৃজনশীলতার রাজ্যে এক গোপন অভিযান

নারীর মন: নারী মনস্তত্ত্বের রহস্যময় দিকগুলি নিয়ে একটি ব্যতিক্রমধর্মী তত্ত্বীয় গ্রন্থ

কল্পকণা (কবিতা)

সৃষ্টিকর্তা সত্যিই আছেন!: Field Theory of the Absolute

আজকের নেতা: সফল নেতৃত্বের শত কৌশল

বক্তৃতার ব্যাকরণ

কোরআনের আলোকে প্রাণের প্রাগৈতিহাসিক উৎস এবং মানব মনের গুপ্ত রহস্য

কোরআন এবং জেনেটিক্স: সৃষ্টির এক গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটিত

কোরআনের অলৌকিক উচ্চারণ এবং তার শক্তির রহস্য: একটি আয়াত কেন পাহাড় টলাতে পারে

কোরআনিক রেফারেন্স

আলাহর নামের মারেফত ও ফজিলত

ইত্যাদি।

নাস্তিকের মনস্তত্ত্ব

এস.এম. জাকির হুসাইন

স্ক্যানের জন্য বইটি দিয়েছেন

গোলাম মাওলা আকাশ

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

এই বইটি বাংলাপিডিএফ.নেট

(fb.com/groups/Banglapdf.net)

বইপোকাদের আড্ডাখানা

(fb.com/groups/boiipoka)

এর সৌজন্যে নির্মিত

WEBSITE:

WWW.BANGLAPDF.NET

কোরআনের আলোকে

নাস্তিকের মনস্তত্ত্ব

নাস্তিকতাবাদ আধুনিক কোনো মতবাদ নয়। তবে আধুনিকতার সাথে এর একটি নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। সব নবীর যুগেই কিছু লোক নাস্তিক ছিলেন। বরং অধিকাংশ লোকই নাস্তিক ছিলেন। এবং যারা এই নাস্তি-কতাবাদের গুরু বা নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তারা ছিলেন ঐ যুগের সাপেক্ষে তাদের অর্থে আধুনিক। সুতরাং নাস্তিকতাবাদের সাথে তথাকথিত আধুনিকতাবাদ উত্তরাধুনিকতা ইত্যাদিকে যদি মেলানো হয় তাহলে তাদের সবগুলি মতবাদের ভিত হিসেবে একই দৃষ্টিভঙ্গিকে আবিষ্কার করা যায়।

নাস্তিকতাবাদ আধুনিক কোনো মতবাদ নয়। তবে আধুনিকতার সাথে এর একটি নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। সব নবীর যুগেই কিছু লোক নাস্তিক ছিলেন। বরং অধিকাংশ লোকই নাস্তিক ছিলেন। এবং যারা এই নাস্তি-কতাবাদের গুরু বা নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তারা ছিলেন ঐ যুগের সাপেক্ষে তাদের অর্থে আধুনিক। সুতরাং নাস্তিকতাবাদের সাথে তথাকথিত আধুনিকতাবাদ উত্তরাধুনিকতা ইত্যাদিকে যদি মেলানো হয় তাহলে তাদের সবগুলি মতবাদের ভিত হিসেবে একই দৃষ্টিভঙ্গিকে আবিষ্কার করা যায়। আল্লাহ বলেছেন যে ওদের মন একই রকমের (সূরা **বাকারা**, আয়াত ১১৮)

কোনো একটি বিশেষ ধর্মে কেউ অবিশ্বাস করলেই তাকে নাস্তিক বলা হয় না। নাস্তিক বলা হয় তাকে যে কোনো ধর্মই স্বীকার করে না এবং তার ভাষায় সে আল্লাহর অস্তিত্বকে, আল্লাহর তরফ থেকে আসমানী গ্রন্থ আসাকে, এবং সেই গ্রন্থে বর্ণিত যাবতীয় তথ্যাবলিকে অস্বীকার করে। নাস্তিকতা এবং নাস্তিক ব্যক্তিদের প্রতি সারা পৃথিবীর মুসলমানগণের একই প্রতিক্রিয়া এবং মনোভাব। আবার বিশেষত বিশ্বাসীদের প্রতি নাস্তিকদের মনোভাবও গোটা পৃথিবী জুড়ে একেবারেই অভিন্ন। সুতরাং

নাস্তিকগণ যে-অর্থে ধার্মিকদের এক অংশকে মৌলবাদী ব'লে থাকে, ঠিক সেই অর্থে তারাও নিঃসন্দেহে মৌলবাদী। নাস্তিকতার কিছু মৌলিক সূত্র ও তত্ত্ব রয়েছে। তারা কেন কোনো ধর্মকে অস্বীকার করে সে ব্যাপারে তাদের কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে বা ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা রয়েছে। এই নিবন্ধে নাস্তিকদের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিৎ, নাস্তিকদের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক রেখে বিশ্বাসীদের চলা উচিৎ, ইত্যাদি বিষয়ে কোনো আলোকপাত করা হবে না। বরং আল্লাহ্ কোরআনে নাস্তি কতাবাদের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তার আলোকে তার স্বরূপ, কারণ এবং মানব জ্ঞানের স্তর বিবেচনায় তার অবস্থান এবং ভবিষ্যত গতিবিধি তথা লুকায়িত সম্ভাবনার প্রতি আলোকপাত করা হবে।

বস্তুবাদের মূল কথা হলো - যা কিছু দেখা যায়, ছোঁয়া যায়, শোনা যায়, তথা পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাই সত্য, তার ওপারে যদি কোনো সত্য থাকেও, তাহলে তাকে আগে থেকে সত্য হিসেবে ধ'রে নেয়ার কোনো দরকার নেই। বরং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণালব্ধ তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে যা কিছু যৌক্তিকভাবে ও নিরাপদভাবে জানা সম্ভব, কেবল সেটুকুকেই বিশ্বাস করতে হবে।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে এমন এক সময় এসেছিল যখন এখানে ধর্মের জোয়ার চলছিল। ঠিক তখনই এখানে অত্যন্ত তত্ত্বভিত্তিক এবং সুচিন্তিত মতামতের ওপর প্রতিষ্ঠিত নাস্তি কতাবাদেরও অস্তিত্ব ছিল। নাস্তি কতাবাদ সক্রিয় রাজনৈতিক এবং সামাজনৈতিক দর্শনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে প্রথম আনুষ্ঠানিকতা পেয়েছিল কার্ল মার্কস এর গ্রন্থগুলিতে। তথাকথিত কমিউনিস্টগণ নিজেদেরকে বস্তুবাদী ব'লে আখ্যায়িত ক'রে থাকে। এই বস্তুবাদের মূল কথা হলো - যা কিছু দেখা যায়, ছোঁয়া যায়, শোনা যায়, তথা পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাই সত্য, তার ওপারে যদি কোনো সত্য থাকেও, তাহলে তাকে আগে থেকে সত্য হিসেবে ধ'রে নেয়ার কোনো দরকার নেই। বরং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও

গবেষণালব্ধ তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে যা কিছু যৌক্তিকভাবে ও নিরাপদভাবে জানা সম্ভব, কেবল সেটুকুকেই বিশ্বাস করতে হবে।

জ্ঞানার্জনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি বস্তুবাদের একটি অঙ্গীকার রয়েছে। আর এই অঙ্গীকার দ্বারা পৃথিবী অনেক লাভবানও হয়েছে। যে মুহূর্তে ধার্মিকগণ, বিশেষত ক্রিশ্চিয়ানিজম এবং ইসলামের অনেক অনুসারী, ধর্মের সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পর্কের প্রকৃত মর্ম না বুঝতে পারার কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছিল, তখনই অস্তিত্বের সার্বিক ভারসাম্য রক্ষা করার প্রয়োজনে অত্যন্ত সংগত কারণে এবং স্বাভাবিকভাবেই বস্তুবাদের আবির্ভাব ঘটেছিল। এবং পৃথিবীতে বস্তুবাদের হক আদায় হয়ে গেছে।

অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতি বস্তুবাদের একটি অঙ্গীকার রয়েছে। আর এই অঙ্গীকার দ্বারা পৃথিবী অনেক লাভবানও হয়েছে। যে মুহূর্তে ধার্মিকগণ, বিশেষত ক্রিশ্চিয়ানিজম এবং ইসলামের অনেক অনুসারী, ধর্মের সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পর্কের প্রকৃত মর্ম না বুঝতে পারার কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছিল, তখনই অস্তিত্বের সার্বিক ভারসাম্য রক্ষা করার প্রয়োজনে অত্যন্ত সংগত কারণে এবং স্বাভাবিকভাবেই বস্তুবাদের আবির্ভাব ঘটেছিল। এবং পৃথিবীতে বস্তুবাদের হক আদায় হয়ে গেছে।

ধার্মিক তার কূপমণ্ডুকতার কারণে তার দৃষ্টি সম্পূর্ণটাই নিবদ্ধ করেছিল বেহেস্ত এবং দোযখের প্রতি। এবং এক পর্যায়ে সেই বেহেস্ত পাওয়ার জন্যে তারা যখন পরকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে শেখাটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করল না, তখন এখানেই তারা তা পেতে চাইল এবং আরাম-আয়েশ ভোগ-লালসা ইত্যাদিতে গা ভাসিয়ে দিল। ধর্মের নামে শুধু যা বাকি রইল, তা হলো শুধু কোরআন মুখস্ত করা, হাদিস মুখস্ত করা। এবং তার মধ্যে কিছু ব্যবসায়ী উপাদানও রইল: যেমন, ধর্মগুরু সেজে অর্থ রোজগার করা বা কোরআনের কিছু কিছু বাণী-বক্তব্য মানুষের

কাছে প্রকাশ্যে তুলে ধ'রে বিনিময় হিসেবে পয়সা রোজগার করা। অথচ আল্লাহ বলেছেন:

আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ কর না।
(সূরা **বাকারা**, আয়াত ৪১)

এসব দেখেশুনে সমাজের এলিট শ্রেণীভুক্ত যারা, তারা ধর্মকে আক্ষরিক অর্থে পরিত্যাগ করতে শিখল এবং বস্তুবাদের প্রতি না হলেও অন্তত ভোগ-লালসা আরাম আয়েশের প্রতি ঝুঁকে পড়ল। এবং ধর্মের জন্যে শুধু রইল সেই লোকগুলো যাদের পেটে দু'বেলা আহার জোটে না, যাদেরকে পার্থিব জীবনে সচ্ছলতা দেয়ার মতো তেমন কর্মকাণ্ড পৃথিবীতে সৃষ্টি হতো না। তথাকথিত জ্ঞানীদের অজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ দেখে জ্ঞানের প্রতি তাদের বিতৃষ্ণা বেড়ে গিয়েছিল ব'লে তারা নিজেরাই অজ্ঞ থাকতে পছন্দ করেছিল। এই সব ব্যক্তিগণ ধর্মচর্চা করতেন এবং জন্মের শুরু থেকেই তারা তাদের অর্থে ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে সেই ধর্মকে শুধু নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেতে লাগলেন। কিন্তু চারদিকের পরিস্থিতি বিমুখ। তাদেরও এমন কোনো জ্ঞান অর্জিত হয়নি যা ব্যবহার ক'রে তারা পার্থিব জীবনে রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারেন। ফলত একটি সময় পরে এই সব লোকই দলে দলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধর্ম ব্যবসায়ে সামিল হয়ে গেল। আজও সেই প্রক্রিয়া চলছে।

বস্তুবাদের মর্মার্থ না জেনেছে বস্তুবাদী, না জেনেছেন অধিকাংশ ধার্মিক। বস্তুবাদ আবশ্যকিভাবে একটি বৈজ্ঞানিক *দৃষ্টিভঙ্গি*, তা কোনো মতবাদ নয়।

যা হোক, বস্তুবাদের মর্মার্থ না জেনেছে বস্তুবাদী, না জেনেছেন অধিকাংশ ধার্মিক। বস্তুবাদ আবশ্যকিভাবে একটি বৈজ্ঞানিক *দৃষ্টিভঙ্গি*, তা কোনো মতবাদ নয়। একজন বিজ্ঞানী যেহেতু প্রকৃতিজগৎকে পর্যবেক্ষণ ক'রে জ্ঞান অর্জন করেন সেহেতু intellectual সততার খাতিরে

তিনি যদি এ কথা বলেন - আমি যা দেখি না বা যা পর্যবেক্ষণ করতে পারি না, তাকে আমি আমার তত্ত্বে স্থান দিতে পারি না - তাহলে তার তরফ থেকে ভুলের কী আছে, দোষের কী আছে? কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে কেউ যদি তার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপায় হিসেবে বেছে নেয়, এবং যাচ্ছেতাই আচরণ করার পক্ষে সাফাই গাওয়ার জন্যে ব্যবহার করে, তাহলে সেই বস্তুবাদ যে রূপ ধারণ করতে পারে, তা আমরা পৃথিবীতে দেখেছি, এবং বর্তমানে অতি মাত্রায় দেখছি। সূরা **মু'মিনুন** আয়াত ৩৫-৪১ বিবেচনা করা যাক। নবীগণের আহবান শুনে অবিশ্বাসীগণ বলছে:

> *সে কি তোমাদেরকে এই রূপ ওয়াদা দেয় যে যখন তোমরা মারা যাবে এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হবে তখন তোমাদেকে আবার জীবিত ক'রে বের করা হবে? তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা বহু দূরে। তা অসম্ভব। এ পার্থিব জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন। এখানেই আমরা মরি ও বাঁচি। আর আমাদের কখনও পুনরায় জীবিত ক'রে ওঠানো হবে না। সে তো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করছে। এবং আমরা কখনও তার প্রতি ঈমান আনার নই। রসূল বললেন - হে আমার রব! আমাকে সাহায্য করুন, কেননা তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। আল্লাহ বললেন - অচিরেই তারা অনুতপ্ত হবে। অতঃপর এক ভয়ংকর আওয়াজ সত্য ওয়াদা অনুসারে তাদেরকে পাকড়াও করল এবং আমি তাদেরকে ক'রে দিলাম ব্যাত্যাতাড়িত খড়-কুটা সদৃশ। সুতরাং দুর্ভোগ জালিমদের জন্য।*

সব রসূলগণ তাদের ধর্মের মূলনীতি হিসেবে যা মানুষের কাছে বর্ণনা করেছিলেন তার একটি আবশ্যিক উপাদান হলো বিচারদিন এবং

জীবন সম্পর্কে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি যদি পুরোটাই দেহ-কেন্দ্রিক হয়ে যায়, তাহলে মানুষ দেহের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব'লে মনে ক'রে ফলে। সে মনে করে যে তার আলাদা কোনো দায়িত্ব ব'লে কিছু নেই; দেহের প্রয়োজন মেটানোই তার প্রধান দায়িত্ব ।

পরকালে বিশ্বাস। যাদের চিন্তা বস্তুকেন্দ্রিক তারা বস্তুকে বিবেচনা করে প্রাণের উৎস হিসেবে, প্রাণের ধারক বা প্রকাশক হিসেবে নয়, ফলে এই মাটির দেহ ম'রে গেলে বা ধ্বংস হয়ে গেলে তা আবার কিভাবে উজ্জীবিত হবে তা তাদের মাথায় আসতে চায় না। আর যা তাদের মাথায় আসে না তা তারা গ্রহণ করবে কিভাবে? জীবন মানে তাদের কাছে কেবল দেহটি। জীবন মানে তাদের কাছে কেবল জীবিত ব্যক্তিটি। ব্যক্তিগতভাবে তাদের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এবং স্বীকৃতি প্রাপ্তির তৃষ্ণা মেটেনি ব'লে তাদের বিপুল আক্রোশ এবং অহংকার রয়ে গেছে। এবং এ কারণে তাদের চিন্তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক তথা দেহকেন্দ্রিক হয়ে যেতে বাধ্য। তাদের চোখের ধুলো সরিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ বলেছেন যে তিনিই সকল বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনিই আদি স্রষ্টা। তিনিই বস্তু থেকে জীবন বের ক'রে আনেন এবং জীবন্ত সত্তাকে জড় বস্তুতে রূপান্তরিত করেন। (দ্র. *আল্লাহর পরিচয়: জাহের ও বাতেন*) অথচ এতেও তাদের মতিভ্রম কাটে না।

জীবন সম্পর্কে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি যদি পুরোটাই দেহ-কেন্দ্রিক হয়ে যায়, তাহলে মানুষ দেহের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব'লে মনে ক'রে ফলে। সে মনে করে যে তার আলাদা কোনো দায়িত্ব ব'লে কিছু নেই; দেহের প্রয়োজন মেটানোই তার প্রধান দায়িত্ব ।

এই বোধ যখন মানুষের মধ্যে অঙ্গীকারের হাত ধ'রে এগিয়ে যেতে থাকে, তখন এক পর্যায়ে তার যুক্তি, চিন্তা-ভাবনা-বিবেক পুরোটাই তার দেহের পক্ষে চ'লে যায়। এবং সে এই জীবনটাকে তেমনভাবে

ভালোবাসতে শেখে যেমনভাবে একজন বিশ্বাসী ভালোবাসতে শেখেন পরকালের জীবনটাকে। ফলে সে এই জীবনে ভোগ লালসা আনন্দ-ফূর্তি এইগুলোকে প্রাধান্য দেয় ব'লে মৃত্যুকে সে স্বাভাবিকভাবে স্বীকার ক'রে নিতে চায় না। মৃত্যুর পর আবার উঠতে হবে, এই কথা স্বীকার করলে কিছু দায়িত্ব এসে ঘাড়ে বর্তায়: এক. আমি এখানে যা করছি বা করেছি বা করব, তার সব কিছুর হিসাব নিকাশের জের সেই পুনর্জন্মের

মৃত্যুর পর আবার উঠতে হবে, এই কথা স্বীকার করলে কিছু দায়িত্ব এসে ঘাড়ে বর্তায়: এক. আমি এখানে যা করছি বা করেছি বা করব, তার সব কিছুর হিসাব নিকাশের জের সেই পুনর্জন্মের সময়ে টানা হবে, ফলে আমি এখানে ইচ্ছা মতো যা-খুশি তা করতে পারব না। দুই. মৃত্যুর পর আবার পুনরুত্থান হবে, এ কথা স্বীকার করতে হলে বিবেকের ওপর অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে তার মাধ্যমে দেহকে শাসন করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেহে সঞ্চিত ভোগ-বিলাসিতা বাসনার শক্তির চেয়ে বিবেকের শক্তি যদি ক'মে যায়, তখন ব্যক্তির দ্বারা তা আর পারা সম্ভব হয় না।

সময়ে টানা হবে, ফলে আমি এখানে ইচ্ছা মতো যা-খুশি তা করতে পারব না। দুই. মৃত্যুর পর আবার পুনরুত্থান হবে, এ কথা স্বীকার করতে হলে বিবেকের ওপর অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে তার মাধ্যমে দেহকে শাসন করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেহে সঞ্চিত ভোগ-বিলাসিতা বাসনার শক্তির চেয়ে বিবেকের শক্তি যদি ক'মে যায়, তখন ব্যক্তির দ্বারা তা আর পারা সম্ভব হয় না। এ কথা আল্লাহ নিজেই ইহুদিগণের প্রসঙ্গে বলেছেন।

কিন্তু তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না, সে কারণে যা তাদের হাত পূর্বে পাঠিয়েছে। আর আল্লাহ জালিমদের সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

(সূরা **বাকারা**, আয়াত ৯৫)

যারা আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না আমি তাদেরকে ছেড়ে রাখি যেন তারা নিজেদের অবাধ্যতায় দিশেহারা অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়।

(সূরা **ইউনুস**, আয়াত ১১)

কাউকে যদি তার মন্দ কর্ম শোভনীয় ক'রে দেখানো হয় এবং সে তাকে উত্তম মনে করে, সে কি তার সমান যে মন্দকে মন্দ মনে করে? নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করেন। অতএব আপনি তাদের জন্য অনুতাপ ক'রে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। তারা যা করে আল্লাহ তা অবশ্যই জানেন।

(সূরা **ফাতির**, আয়াত ৮)

মানুষ নিজের দুর্বলতাকে প্রকাশ করতে চায় না ব'লে তার যুক্তি দ্বারা তার অনুভূতির পক্ষে সাফাই গায়।

কিন্তু মানুষ নিজের দুর্বলতাকে প্রকাশ করতে চায় না ব'লে তার যুক্তি দ্বারা তার অনুভূতির পক্ষে সাফাই গায়। এখানে একটি রহস্যময় কথা রয়েছেঃ কাফেররা বলছে - এই পার্থিব জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন। এখানেই আমরা মরি-বাঁচি। আমাদেরকে কখনও আবার জীবিত করা হবে না। ইত্যাদি। আবার তারাই বলছে, নবী সম্বন্ধে - সে তো এমন এক ব্যক্তি যে 'আল্লাহ' সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে। তারা এভাবে বলছে না যে - সে এমন এক ব্যক্তি যে 'আল্লাহ' নামক কোনো কিছু একটি উদ্ভাবন করেছে; সে মিথ্যে একটি ধারণা উদ্ভাবন করেছে। তা তারা বলছে না। বরং তারা বলছে যে, নবী 'আল্লাহ' সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছেন। অর্থাৎ 'আল্লাহর' ধারণাটিকে তারা সজ্ঞানে হোক আর অজ্ঞানেই হোক, 'আল্লাহ' শব্দটিকে ব্যবহার ক'রে হোক আর না ক'রে হোক, স্বীকার ক'রে নিচ্ছে।

কিন্তু অবিশ্বাসীগণ কি কখনও 'আল্লাহ' শব্দটি উচচারণ ক'রে থাকে? না। এবং বিশ্বাসীদের সাথে তর্কের ক্ষেত্রে তারা নিশ্চয়ই এমনভাবে কথা বলবে না যা থেকে বুঝা যায় আল্লাহকে তারা সত্যি ধ'রে নিচ্ছে। অথচ আল্লাহ নিজেই এই আয়াতে বলছেন যে কাফেররা বলেছিল যে- সে তো এমন এক ব্যক্তি যে *আল্লাহ* সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে। তাহলে কাফেররা তাদের কথার মধ্যে কোন ইঙ্গিতটি করেছে, যে ইঙ্গিতটি মূলত আল্লাহর প্রতি যায়? যে ইঙ্গিতটি মূলত আল্লাহকে নির্দেশ করে? এই আয়াতটির একটি গূঢ় অর্থ রয়েছে, অনেক তাৎপর্য রয়েছে। আমি এর মধ্যে প্রবেশ করতে চাই না। এখন আর একটি আয়াত বিবেচনা করি। যারা নাস্তিক এবং অবিশ্বাসী, তাদের মনস্তত্ত্বের একেবারে মৌলিক দিকটিকে চিহ্নিত ক'রে আল্লাহ সূরা **আনআম,** আয়াত ৯১-তে বলছেন:

> *আর তারা আল্লাহর মর্যাদা সেরূপে উপলব্ধি করেনি যেরূপে উপলব্ধি করা উচিত ছিল।*

যারা কোরআনকে গভীরভাবে বুঝতে পারে না তাদের সঙ্গে কোরআনের প্রতিটি ভাষা আবেগের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কথা বলে। কোরআনের ভাষা এবং ইঙ্গিত তাদের জ্ঞানের স্তর পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে না, কেবল আবেগের স্তর পর্যন্ত পৌঁছায়, যা তথাকথিত ধার্মিক এবং নাস্তিক কাফের উভয়ের ক্ষেত্রে সত্য।

এই কথাটি সচরাচর যখন কোনো ধার্মিক ব্যক্তি শোনেন বা পড়েন, তখন তিনি মনে করেন যে অবিশ্বাসীরা যেহেতু আল্লাহকে মর্যাদাবান মনে করেনি, সেহেতু তারা ঘৃণিত এবং তারা আল্লাহকে ছোট করেছে ব'লে আমরাও তাদেরকে ছোট হিসেবে জানলাম। যারা কোরআনকে গভীরভাবে বুঝতে পারে না তাদের সঙ্গে কোরআনের প্রতিটি ভাষা আবেগের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কথা বলে। কোরআনের ভাষা এবং

ইঙ্গিত তাদের জ্ঞানের স্তর পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে না, কেবল আবেগের স্তর পর্যন্ত পৌঁছায়, যা তথাকথিত ধার্মিক এবং নাস্তিক কাফের উভয়ের ক্ষেত্রে সত্য। তারা যদি আল্লাহকে মর্যাদা না দিয়ে থাকে, তো 'তাদের' আল্লাহকে তারা মর্যাদা দেয়নি। তাতে আমার রেগে যাওয়ার বা ক্ষুব্ধ হওয়ার কিছু নেই। বা কষ্ট পাওয়ারও কিছু নেই। আমি শুধু আল্লাহর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী তাকে অবিশ্বাসী হিসাবে চিহ্নিত করতে পারলাম, এইটুকুই যথেষ্ট। তাই তো আল্লাহ রসূল (স.)-কে বলছেন:

> *তারা ঈমান আনে না ব'লে আপনি হয়ত মর্মব্যথায় প্রাণ বিসর্জন দেবেন।*
>
> (সূরা **শু'আরা**, আয়াত ৩)

এর আগে সূরা **ফাতির** আয়াত ৮-এ আমরা দেখেছি যে এরূপ অর্থহীন আবেগের অনুসরণ করলে মনের শক্তির অপচয়ই ঘটে। পরবর্তীতে এক পর্যায়ে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ হিংসাবৃত্তি মনে বাসা বাধে। সুতরাং কেন আমরা অবিশ্বাসীর প্রতি আবেগপ্রবণ হব? বরং আমি যদি এই কথার মধ্য দিয়ে সত্যিকারের অর্থে জ্ঞান খুঁজতাম, তাহলে খুঁজে দেখতাম যে আসলে এই কথাটির অর্থ কী। তারা ইচ্ছা ক'রে আল্লাহকে মর্যাদাবান ভাবেনি - তাই কি? না কি তারা আল্লাহর মর্মটা **উপলব্ধি করতে পারেনি?** অত্যন্ত দৈনন্দিন একটি উপমা দিয়েই আমরা আয়াতটির মর্ম উপলব্ধি করতে পারি। যেমন, যুগে যুগে যারা এক আল্লাহতে বিশ্বাস করেছেন এবং ধর্মের ছায়াতলে নিয়মতান্ত্রিকভাবে জীবনযাপন করেছেন, তারা সচরাচর বিনয়ী দরিদ্র এবং উচ্ছৃঙ্খলতাবর্জিত। যারা সমাজের উঁচুতলার মানুষ এবং বুদ্ধিবৃত্তি, ক্ষমতা তথা ধন সম্পদের দিক থেকে এলিট শ্রেণীর মানুষ, তারা এই সব সাধারণ বিনয়ী কোমল-মনা এবং দরিদ্র ধার্মিকদের দিকে তাকিয়ে ভেবেছে - এই ব্যক্তিগুলি কিভাবে মর্যাদা

পেতে পারে? তাদের কী বা মর্যাদা আছে? সমাজের কোন স্তরে তাদের অবস্থান? এবং তারা 'আল্লাহ' নামক বস্তু বা ধারণাটি নিয়ে কিভাবে মাতামাতি করছে? কি এক হাওয়ার পিছনে সারাটা জীবন আশা-আকাঙ্ক্ষা সবকিছু ব্যয়িত ক'রে দিচ্ছে! কিভাবে তারা তা পারছে? এই অনুভূতি অবিশ্বাসী মনের একটি চিরন্তন অনুভূতি। ঠিক একই ভাবে আমরা অবিশ্বাসীদের কূপমণ্ডুকতা লক্ষ করি যে - অত্যন্ত জ্ঞানী, বিশাল বিশাল ডিগ্রিধারী, ব্যহ্যিক আচরণে অত্যন্ত বিনয়ী, অনেকেই ব'লে থাকেন - লোকটি অত্যন্ত ভালো - তা সত্ত্বেও ধর্ম, সত্য, আসমানী গ্রন্থ ও নবীগণ সম্পর্কে তারা যে মন্তব্য ক'রে থাকে, তা শুনলে এবং জানলে নিজের মনের মধ্যেই ধরতে পারা যায় যে, এক দিকে তারা আসলে কতটা নীচু, দুর্বল, অজ্ঞ, এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন। তখন সাধারণ মানুষ মাত্রেই অবাক হয়। এত বড় ব্যক্তি, এত বড় জ্ঞানী, অথচ আমি তাকে মর্যাদা দিতে পারছি না, সন্মান দিতে পারছি না, এ কেমন কথা! সে নিজেই এই প্রকাশ্য সত্যকে বুঝল না? একই কারণে যারা অবিশ্বাসী, তারা আল্লাহকে মর্যাদাবান ভাবতে শেখেনি। বরং তারা যেহেতু এভাবেই ভাবতে শিখেছে যে আল্লাহকে আঁকড়ে ধরা আর হাওয়ার পিছনে ছোটা একই কথা, সেহেতু তারা অবশ্যই আল্লাহর নাম উচচারিত হলে অনায়াসেই তাচ্ছিল্য করবে, এটাই স্বাভাবিক।

অত্যন্ত জ্ঞানী, বিশাল বিশাল ডিগ্রিধারী, ব্যহ্যিক আচরণে অত্যন্ত বিনয়ী, অনেকেই ব'লে থাকেন - লোকটি অত্যন্ত ভালো - তা সত্ত্বেও ধর্ম, সত্য, আসমানী গ্রন্থ ও নবীগণ সম্পর্কে তারা যে মন্তব্য ক'রে থাকে, তা শুনলে এবং জানলে নিজের মনের মধ্যেই ধরতে পারা যায় যে, এক দিকে তারা আসলে কতটা নীচু, দুর্বল, অজ্ঞ, এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন।

নাস্তিক মনের কতগুলি খুঁটি রয়েছে। খুঁটিগুলো হলো ঠিক ধার্মিক মনের খুঁটিগুলির বিপরীত। তবে সেগুলি একই ভাবে কাজ করে। ধর্মের যেমন খুঁটি রয়েছে, এবং যেমন ধার্মিক মনের বা ঈমানেরও খুঁটি রয়েছে, নাস্তি

ক মনেরও ঠিক একই ভাবে কিছু খুঁটি রয়েছে। যেমন: ধার্মিক যা যা বিশ্বাস করে, নাস্তিক তা তা অবিশ্বাস করে; শুধু তাই নয়, ধার্মিক ধর্মের

ধর্মের যেমন খুঁটি রয়েছে, এবং যেমন ধার্মিক মনের বা ঈমানেরও খুঁটি রয়েছে, নাস্তিক মনেরও ঠিক একই ভাবে কিছু খুঁটি রয়েছে।

আবশ্যিক বিষয়াবলিকে বিশ্বাস করতে না পারলে মনের মধ্যে সুবিধে পায় না, আনন্দ পায় না, আস্থা পায় না। একই ভাবে, নাস্তিক ব্যক্তি ধর্মের মৌলিক কাঠামোগুলিকে অস্বীকার না করতে পারলেই আনন্দ পায় না, স্বস্তি পায় না। এবং ধার্মিক কামনা করে যে সে যেহেতু সত্যকে কিছু না কিছু অনুভব করতে পেরেছে, আল্লাহর কোনো না কোনো দয়ার কারণে সত্যের ছায়াতলে এসে আশ্রয় নিতে পেরেছে, সেহেতু আর দশজনের যেন এই সৌভাগ্য হয়। এই কামনার কারণে সে ধর্মকে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছানোর চেষ্টা করে এবং সাধ্য মতো ধর্মের প্রসার কামনা করে। নাস্তিকও ঠিক এর বিপরীতে কাজ করে - সে এমনভাবে কাজ করে বা এমন পরিস্থিতিকে সৃষ্টি ক'রে রাখতে চায়, যেন ধর্ম প্রচারিত হতে না পারে । ধর্মিক তার ধর্মের মূল যে দলিল, তার সত্যতা প্রমাণে চিরকাল ব্যস্ত থাকে। নাস্তিক ঠিক ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বক্রতা অনুসন্ধান করে। অর্থাৎ এমন এমন তথ্য ও বাণী অনুসন্ধান করে যাকে আপাতভাবে কোনো না কোনো দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে আত্মবিরোধী, ভ্রান্ত, বানোয়াট, ভুল এবং হাস্যকর ব'লে প্রমাণ করা যাবে। ধার্মিক ধর্মের ছায়াতলে থাকতে গিয়ে পরকালকে বিশ্বাস করে, কারণ পরকালকে বিশ্বাস না করলে ইহকালকে ত্যাগ করা বা অবিশ্বাস করা বা ইহকালে ভোগলালসার মহাসমুদ্রে তীব্র আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে দূরে থাকা খুব কঠিন হয়ে যায়। তাছাড়া যা সত্য তাকে অস্বীকার করা ধার্মিকের পক্ষে সম্ভবই নয়। নাস্তিক ঠিক এর বিপরীতটি করে: সে পরকালকে একেবারেই অবিশ্বাস করে। সূরা **আরাফ** আয়াত ৪৫।
এখানে আল্লাহ বলছেন:

> *যারা আল্লাহর পথে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা খুঁজে বেড়াত, তারা আখেরাতকে অবিশ্বাস করত।*

ধার্মিকগণের মনোভাবের সাপেক্ষে নাস্তিকগণের এই যে-১৮০° উল্টো মনোভাব, এর রহস্য কী? কেন তারা তাতে বিশ্বাস করতে পারে না, যাতে ধার্মিকগণ বিশ্বাস করেন? এই প্রশ্নের অনেকগুলি সঠিক উত্তর হতে পারে। তবে সবচেয়ে প্রধান যে কারণ, তা অজ্ঞতা নয়। বরং তা হলো এক জাতীয় জ্ঞান, যা অহংকারের ছোঁয়ায় কলুষিত হয়ে গেছে। সচরাচর সব যুগের নাস্তিকগণ ঐ যুগের standard বা মাপকাঠি অনুযায়ী সবচেয়ে জ্ঞানী হয়ে থাকেন।

ধার্মিকগণের মনোভাবের সাপেক্ষে নাস্তিকগণের এই যে-১৮০° উল্টো মনোভাব, এর রহস্য কী? কেন তারা তাতে বিশ্বাস করতে পারে না, যাতে ধার্মিকগণ বিশ্বাস করেন? এই প্রশ্নের অনেকগুলি সঠিক উত্তর হতে পারে। তবে সবচেয়ে প্রধান যে কারণ, তা অজ্ঞতা নয়। বরং তা হলো এক জাতীয় জ্ঞান, যা অহংকারের ছোঁয়ায় কলুষিত হয়ে গেছে। সচরাচর সব যুগের নাস্তিকগণ ঐ যুগের standard বা মাপকাঠি অনুযায়ী সবচেয়ে জ্ঞানী হয়ে থাকেন। আসলে এই প্রশ্নের উত্তর আমরা আগে দিয়েই ফেলেছি; যে, তারা যখন লক্ষ করে যে - সব লোক দলে দলে ধর্ম নামক ছায়ার নীচে এসে দাঁড়াচ্ছে, সেই লোকগুলি যারা সমাজে একেবারেই পরিত্যক্ত, সাধারণ, নগণ্য, অবিখ্যাত, তখন তাদের আত্মসন্মানবোধে একটু ঝাঁকুনি লাগে, এবং তারা তাদের দলভুক্ত হতে চায় না। এর নাম অহংকার। সূরা **আরাফ** আয়াত ৭৬ এ আল্লাহ বলছেন:

> *যারা অহংকার করেছিল তারা বলল, তোমরা যাতে বিশ্বাস করেছ আমরা তাতে অবিশ্বাস করছি।*

কথাটি অত্যন্ত সাধারণ, কিন্তু আসলে এর মধ্যে মূল কারণটি লুকিয়ে রয়েছে। অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে ডেকে কী বলছে - আল্লাহ শুধু তাই ব'লে দিয়েছেন। কিন্তু কেন তারা এই কথাটি বলল তাও এই কথাটির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। তারা বলছে - তোমরা যাকে বিশ্বাস করেছ, আ

যার অন্তর অহংকারমুক্ত নয়, তার কাছে ধর্মগ্রন্থের জ্ঞানের আসল শ্বাস বা মজ্জাটি কখনোই ধরা দেবে না।

মরা তাকে অবিশ্বাস করছি। অর্থাৎ তোমরা বিশ্বাস করছ ব'লেই আমরা তা অবিশ্বাস করছি। *তোমরা* যদি বিশ্বাস না করতে, নিশ্চয়ই *আমরা* তাতে বিশ্বাস করতাম। কারণ ঐ সব 'সাধারণ' মানুষদের কাতারভুক্ত হলে তাদের মনগড়া অসাধারণত্ববোধ ধুলায় লুটিয়ে পড়বে। তবে সংগত কারণে নাস্তিকগণের অনেকে ব্যহ্যিক অর্থে জ্ঞানী হওয়ার কারণে তারাও ধর্মগ্রন্থ নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, বিচার বিশ্লেষণ গবেষণা করেন, এবং তারা এইটুকু বোঝার চেষ্টা করেন যে, দলে দলে সাধারণ, নীচু শ্রেণীর লোকেরা কিভাবে এবং কেন ধর্ম নামক 'আফিমে' নেশা ক'রে বুদ হয়ে পড়ে থাকে, এর জবাব খুঁজতে গিয়ে তারা ধর্মীয় স্ক্রিপ্চারগুলিকে তাদের মতো ক'রে ব্যবহার করেন। কিন্তু ধর্মগ্রন্থগুলির জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যার অন্তর অহংকারমুক্ত নয়, তার কাছে ধর্মগ্রন্থের জ্ঞানের আসল শ্বাস বা মজ্জাটি কখনোই ধরা দেবে না। ফলে তারা এক অংশ ঠিকই বুঝতে পারেন, কিন্তু ঐ অংশ বোঝার কারণেই তাদের মনে এত বেশি প্রশ্ন সঞ্চিত হয়, যার জবাব তারা আর ঐ অংশ থেকে বা বাকি অংশ থেকে গ্রহণ করতে পারেন না। ফলে তাদের অবিশ্বাস আরো বেড়ে যায়। তারা মূলত সেই জিনিসকে অস্বীকার করেন যা তাদের মস্তিষ্কে বোধগম্য হয় না। আল্লাহ নিজেই তা বলছেন সূরা **ইউনূস** আয়াত ৩৯ এ:

> *বরং তারা অস্বীকার করে সে বিষয় যার জ্ঞান তারা আয়ত্ত করতে পারেনি।*

অর্থাৎ যে বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে তারা জানতে চায়, কিন্তু সে বিষয়ের জ্ঞান যদি তারা আয়ত্ত করতে না পারে, তখন তাকেই তারা অস্বীকার করে। কারণ তা যদি তখন অস্বীকার করা না হয়, তাহলে তাদের দুর্বলতা এবং অক্ষমতাই ধরা প'ড়ে যাবে, অহংকার

বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই হলো আয়াতটির 'অস্তিত্ববাদী' অর্থ। কিন্তু এরও গভীরে এর একটি আধ্যাত্মিক অর্থ রয়েছে: মানুষ *কেন* তা অস্বীকার করে যা সে বুঝতে পারে না? এর দু'টি কারণ রয়েছে: এক. মানুষ যা বুঝতে পারে না তা অস্বীকার করার মাধ্যমে সে নিজেই চিন্তামুক্ত, উদ্বিগ্নতামুক্ত থাকতে চায়, মস্তিষ্কের ঝঞ্ঝাট বাড়াতে চায় না। দুই. সে যা বুঝতে পারে না, তা সে অস্বীকার করতে চায়, এই জন্যে যে, তার দুর্বলতা, অক্ষমতা, অজ্ঞতা যেন অন্যের কাছে ধরা না পড়ে। কিন্তু

জ্ঞান এমন বিষয় যা অর্জন করার আগ পর্যন্ত মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হয় না। কিন্তু আদম সন্তানকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা এবং জ্ঞান অর্জনের প্রবণতা তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই থাকে। এই কারণে আরশ থেকে ফরাশ পর্যন্ত এমন কোনো বিষয় নেই যে বিষয়ে মানুষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। তবে এই জ্ঞান মানেই যে তথ্যপুঞ্জ এবং তত্ত্বীয় বাণী-কাঠামো, তা আদৌ নয় কিন্তু।

এরও মূলে একটি অর্থ রয়েছে: এই দু'টি কারণের মূল হলো একটি মাত্র কারণ - **মানুষকে আল্লাহ পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের সম্ভাবনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন**। জ্ঞান এমন বিষয় যা অর্জন করার আগ পর্যন্ত মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হয় না। কিন্তু আদম সন্তানকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা এবং জ্ঞান অর্জনের প্রবণতা তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই থাকে। এই কারণে আরশ থেকে ফরাশ পর্যন্ত এমন কোনো বিষয় নেই যে বিষয়ে মানুষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। তবে এই জ্ঞান মানেই যে তথ্যপুঞ্জ এবং তত্ত্বীয় বাণী-কাঠামো, তা আদৌ নয় কিন্তু। সে যাই হোক, মানুষকে যেহেতু সবই শিক্ষা দেয়া হয়েছে, বা সবকিছু শেখানোর পটভূমি যেহেতু তার মেধা-মননে আগে থেকেই গ'ড়ে দেয়া হয়েছে, সেহেতু সে যা জানে না, তা জানতে চায়, এবং যা জানতে পারে না, তাকে অস্বীকার করতে চায় - অস্বীকার ক'রে সে নিজের অজান্তে নিজেকে এটুকু বুঝাতে চায় যে, পৃথিবীতে এমন কিছু থাকতে পারে না যা আমি জানতে পারি না। এ আসলে তার ভিতর লুকানো এক অনন্য ক্ষমতার একটি তাৎক্ষণিক বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কেউ যদি তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি নজর না করে, তাহলে তা স্বয়ংক্রিয়

রূপ পেয়ে অধিকাংশ সময়েই এমন ভ্রান্তিপূর্ণ দিকে গড়িয়ে যেতে পারে, যা সে আগে কখনও ভাবেনি। এরিস্টোটল বলেছিলেন Nature abhors vacuum - প্রকৃতি শূন্যতা পরিহার করে। আর এখন আমরা কোরআনের আলোকে জেনেছি - Human brain abhors ignorance - মানুষের মস্তিষ্ক অজ্ঞতাকে অস্বীকার করতে চায়। ফলে হয় সে জ্ঞান অর্জন ক'রে অজ্ঞতা দূর করে, না হয় কোনো জ্ঞানকে অস্বীকার ক'রে এইটুকু বোঝাতে চায় যে, সে যা জেনেছে তা পূর্ণাঙ্গই। মানুষের এই সার্বিকতাধর্মী intellectual অনুভূতি মানুষকে যাবতীয় সৃষ্টিকূল থেকে আলাদা করেছে। এ কারণেই মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। তবে তার এই শ্রেষ্ঠত্বই তার ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

মানুষের মস্তিষ্ক অজ্ঞতাকে অস্বীকার করতে চায়। ফলে হয় সে জ্ঞান অর্জন ক'রে অজ্ঞতা দূর করে, না হয় কোনো জ্ঞানকে অস্বীকার ক'রে এইটুকু বোঝাতে চায় যে, সে যা জেনেছে তা পূর্ণাঙ্গই। মানুষের এই সার্বিকতাধর্মী intellectual অনুভূতি মানুষকে যাবতীয় সৃষ্টিকূল থেকে আলাদা করেছে। এ কারণেই মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। তবে তার এই শ্রেষ্ঠত্বই তার ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

আমরা আগেই বলেছি যে নাস্তিকগণ ধর্মগ্রন্থ তথা কোরআনের বাণীগুলিকে হয় অস্বীকার করে, না হয় তার মধ্যে বক্রতার সন্ধান করে। তা যদি না পারে, তাহলে তারা সেই বাণীগুলিকে ভুল ব্যাখ্যা করে, কিংবা কোরআনে ভবিষ্যদ্বাণীসূচক যে কথাগুলো বলা হয়েছে তাকে নিজের অজান্তেই কোনো না কোনোভাবে সত্য ধ'রে নিয়ে আগে থেকে এমন প্রস্তুতিমূলক বা আত্মরক্ষামূলক কাজ তারা করতে থাকে, যা দ্বারা তারা আশা করে যে তা কোরআনের বাণীগুলির ব্যর্থতাকেই তুলে ধরবে এবং এই চেষ্টার কাজে তারা অর্থ মেধা সময় সবই ব্যয় করে। সূরা **হজ্জ** আয়াত ৫১তে আল্লাহ আমাদেরকে এ কথা ব'লে দিচ্ছেন:

> *আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার উদ্দশ্যে চেষ্টা করে তারাই হবে দোযখের অধিবাসী।*

কোরআনকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সন্ধান না করতে পারায় তাদের মনে সন্ধানের যে তৃষ্ণাটুকু রয়ে গিয়েছিল তা তারা প্রয়োগ করে পুরানো পুথিপুস্তক, ঐতিহাসিক গবেষণা, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ইত্যাদির ওপর।

তারা কোরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য তার মধ্য থেকে, তার বাইরে থেকে, এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে বিভিন্ন তথ্য প্রমাণাদি, ঠাট্টা বিদ্রুপের গল্প, তত্ত্বকথা, ইতিহাস ইত্যাদি সংগ্রহ করে। কোরআনকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সন্ধান না করতে পারায় তাদের মনে সন্ধানের যে তৃষ্ণাটুকু রয়ে গিয়েছিল তা তারা প্রয়োগ করে পুরানো পুথিপুস্তক, ঐতিহাসিক গবেষণা, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ইত্যাদির ওপর। এবং তারা পুরানো পুথিপুস্তকের মধ্য দিয়ে সত্যকে আবিষ্কার করে এবং তার মাধ্যমে তারই আলোকে সত্যকে সংজ্ঞায়িত ক'রে সেই সংজ্ঞানুসারে কোরআনকে ব্যাখ্যা করতে চায়। আসলে তারা পুরানো পুথিপুস্তক ইত্যাদির মধ্যে সত্যকে যেভাবে চিহ্নিত করে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ফেলনা নয়। কিন্তু তারা যেহেতু কোরআনকে চিহ্নিত করতে পারেনি, সেহেতু তারা কোরআনের প্রতি ঠাট্টা বিদ্রুপ হেতু তাদের অর্জিত জ্ঞানকে ব্যবহার করে। সূরা **লোকমান** আয়াত ৬ -এ আল্লাহ বলছেন:

পক্ষান্তরে মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ্ করার জন্য অজ্ঞতাবশত অসার কথাবার্তা সংগ্রহ ক'রে নেয় এবং আল্লাহ-প্রদর্শিত পথকে ঠাট্টা বিদ্রুপের বিষয় বানায়।

এর পরবর্তী আয়াতে বলা হচ্ছে:

যখন তার কাছে আমার আয়াত পাঠ করা হয় তখন সে অহং-কার ক'রে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন সে শুনতেই পায়নি, যেন তার কর্ণদ্বয়ের মধ্যে বধিরতা রয়েছে।

নাস্তিকগণের মনোভাবের এই প্রকাশ সম্ভবত আমরা সব সময়ে লক্ষ করেছি। তাদেরকে যা কিছু বলা হয়, তা তারা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শোনে। কিন্তু যেই কোরআনের প্রসঙ্গে কথা ওঠে, তারা এমন ভান করে, যেন শোনেনি। আবার, কখনো কখনো তারা কোরআনের প্রসঙ্গে কথা উঠলে অন্যান্য যুক্তিতর্কের মধ্যেও ঢুকে পড়তে চায় এবং এমন অনেক যুক্তির অবতারণা করে যা থেকে এই ইঙ্গিত উঠে আসে যে কোরআন নিয়ে চিন্তা করা মানেই সময় নষ্ট করা। সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। সূরা **সাবা** আয়াত ৫:

তাদেরকে যা কিছু বলা হয়, তা তারা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শোনে। কিন্তু যেই কোরআনের প্রসঙ্গে কথা ওঠে, তারা এমন ভান করে, যেন শোনেনি। আবার, কখনো কখনো তারা কোরআনের প্রসঙ্গে কথা উঠলে অন্যান্য যুক্তিতর্কের মধ্যেও ঢুকে পড়তে চায় এবং এমন অনেক যুক্তির অবতারণা করে যা থেকে এই ইঙ্গিত উঠে আসে যে কোরআন নিয়ে চিন্তা করা মানেই সময় নষ্ট করা।

> *আর যারা আমার আয়াত সমূহকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা **জানে** যে আপনার রবের তরফ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা সত্য এবং তা প্রবল প্রতাপশালী সর্বগুণে গুণান্বিত আল্লাহর পথ প্রদর্শন করে। কাফেররা বলে - আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দেব যে তোমাদেরকে সংবাদ দেয় যে, যখন তোমরা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে তার পর আবার তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে সজ্জিত হবে? জানি না সে কি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে? না তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে? - বরং **যাঁরা আখেরাতে ঈমান রাখে না** তারাই রয়েছে আযাবে ও ঘোর পথভ্রষ্টতায়। তবে কি তারা তাদের সামনে ও তাদের পিছনে যে আসমান ও জমিন রয়েছে তার প্রতি লক্ষ করে না? আমি যদি ইচ্ছা করি তবে তাদেরকে সহ জমিন ধ্বসিয়ে দিতে*

পারি অথবা তাদের উপরে আসমানের খণ্ডসমূহ প্রথিত করতে পারি। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে আল্লাহ অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য নিদর্শন।

(সূরা **সাবা** আয়াত ৫ থেকে ৯)

এখানে আল্লাহ বলছেন যে যারা অবিশ্বাসী তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে। এই কথা আমরা আগেও দেখেছি। এবং আল্লাহ আরো বলছেন যে, যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা **জানেন** যে এই কোরআন সত্য, এই বাণী পুরোপুরি সত্য। তাহলে কথা হলো: কাফেররা যা বলে, তারা কেন তা বলে? তারা কি কোনো *জ্ঞানের* আলোকে তা বলে? সাত নম্বর আয়াতে কাফেররা যে অভিযোগ করছে আল্লাহ তা বর্ণনা করছেন - আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দেব যে তোমাদেরকে সংবাদ দেয় যে, যখন তোমরা সম্পূর্ণরূপে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, তার পর আবার তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে সজ্জিত হবে? তারা এই কথাগুলি বলতে পারল কী ক'রে? 'কোনো কিছু চূর্ণবিচূর্ণ ভষ্মিভূত বা বিগলিত হয়ে গেলে আবার তা নতুন ক'রে সজ্জিত হবে না' - এই কথাগুলি তারা কিভাবে বলল? এই সিদ্ধান্ত টি কি তাহলে জ্ঞান-ভিত্তিক বা তথ্য-সমৃদ্ধ নয়? হতে পারে নিছক মনগড়া কথা, কিংবা এই কথাগুলিকে হয়তো তারা তাদেরই জ্ঞানের আলোকে বলেছে। কিন্তু সেই জ্ঞানকে আল্লাহ 'জ্ঞান' বলেননি। যে কারণে আল্লাহ বলেছেন - যাদেরকে 'জ্ঞান' দেয়া হয়েছে তারা *'জানে'* যে এ আপনার রবের তরফ থেকে সত্য। আবার সেই কাফেররাই বলছে - 'জানি না সে কি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে, না তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে'। এখানেও একটি মজার বিষয় লক্ষ করতে হবে। তারা বলছে না যে সে 'আল্লাহ' নামক একটি মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে বা আবিষ্কার করেছে। বরং বলছে যে সে *আল্লাহর* প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে। তা হলে তারা নিজেরাই 'আল্লাহ' ব'লে কোন জিনিসটিকে ধ'রে নিয়েছে, যার

আল্লাহর সম্ভাবনাকে তারা অস্বীকার করছে না, উড়িয়ে দিচ্ছে না, বা সে যোগ্যতাই তাদের নেই। তাই আল্লাহ

বলছেন যে তারা এমন দাবি করছে যে রসূলগণই যেন আল্লাহর প্রতি 'মিথ্যারোপ' করছেন। তাহলে তারা আল্লাহর প্রতি যা বলছে, সেটিই কি সত্যারোপ?

সম্পর্কে রসূল (স.) যা বলছেন তা তাদের দৃষ্টিতে মিথ্যা? তাহলে আল্লাহ সম্পর্কে *কোন* কথাগুলি বললে সেই কথাগুলি তাদের দৃষ্টিতে সত্য হয়ে যাবে? আল্লাহর সম্ভাবনাকে তারা অস্বীকার করছে না, উড়িয়ে দিচ্ছে না, বা সে যোগ্যতাই তাদের নেই। তাই আল্লাহ বলছেন যে তারা এমন দাবি করছে যে রসূলগণই যেন আল্লাহর প্রতি 'মিথ্যারোপ' করছেন। তাহলে তারা আল্লাহর প্রতি যা বলছে, সেটিই কি সত্যারোপ? তারা কী বলছে? তারা বলছে - আল্লাহ নেই। যদি তা ব'লে থাকে এবং তার পর যদি এ কথা ব'লে থাকে যে "আল্লাহ নেই' এই কথাটির মাধ্যমেই আল্লাহর প্রতি সত্যারোপ করা হলো", তাহলে এই কথাটি নিছক একটি বাক্য মাত্র। অথচ মজার ব্যাপার হলো, এই বাক্যটিকে তারা যাঁর ওপর আরোপ করছে, তাকে কিন্তু সত্য ব'লে ধ'রেই নিয়েছে। এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক মহাবিস্ময়।

এখানে একটি শুভংকরের ফাঁকি লুকিয়ে রয়েছে। তাওহীদের রহস্য না বুঝলে বা হৃদয়ঙ্গম না করতে পারলে এর মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব নয়, যে কারণে আমি এ নিয়ে আর বেশি আলোচনা করতে চাই না। আমার জ্ঞানের যে দৌড়, তাতে এই বিষয়ক অধিক আলোচনা সঠিক না-ও থাকতে পারে। সুতরাং নিবৃত্ত হলাম।

যারা নাস্তিকতায় বিশ্বাসী - নাস্তিকতা তাদের একটি বিশ্বাসমাত্র। তারা যদিও বলে যে তারা আল্লাহতে এবং ধর্মে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান দিবসে বিশ্বাস করে না, তারা যদিও বলে যে ধার্মিকগণ তাদের এই বিশ্বাসকে কোনো জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেনি, তবুও তারা যখন তাদের নাস্তিকতাকে ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যে উপস্থাপন করে, এবং ধর্মকে যে zeal বা উৎসাহ দ্বারা মানুষ আঁকড়ে ধওে, সেই উৎসাহেই নাস্তিকতাকে আঁকড়ে ধরে, তখন প্রমাণিত হয়ে যায় যে নাস্তিকতায় তাদের

যারা নাস্তিকতায় বিশ্বাসী - নাস্তিকতা তাদের একটি বিশ্বাসমাত্র। তারা যদিও বলে যে তারা আল্লাহতে এবং ধর্মে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থান দিবসে বিশ্বাস করে না, তারা যদিও বলে যে ধার্মিকগণ তাদের এই বিশ্বাসকে কোনো জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেনি, তবুও তারা যখন তাদের নাস্তিকতাকে ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যে উপস্থাপন করে, এবং ধর্মকে যে zeal বা উৎসাহ দ্বারা মানুষ আঁকড়ে ধওে, সেই উৎসাহেই নাস্তিকতাকে আঁকড়ে ধরে, তখন প্রমাণিত হয়ে যায় যে নাস্তিকতায় তাদের রয়েছে অগাধ *বিশ্বাস*।

রয়েছে অগাধ *বিশ্বাস*। কারণ যারা ধার্মিক তারা নাস্তিকগণের মতে তাদের ধর্মের রহস্য না জেনে, সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না অর্জন ক'রে, এমনকি ধর্মবোধকে জ্ঞানের ভিতরে চিত্রায়িত না করতে পেরেও, বিশ্বাস করতে পেরেছেন। এই কারণে তারা তাদের চোখে এত হেয়, এত নীচু। অথচ মজার ব্যাপারটি হলো এই যে, নাস্তিকগণ তাদের জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি চালাকি সৃজনশীলতা সবকিছুকে যাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে থাকে, তাঁর বিরুদ্ধে এ সব কিছু প্রয়োগ করা কিভাবে যুক্তিসংগত হলো তা আর তারা প্রমাণ করতে পারে না। **তারা মূলত ধার্মিকের সাথে পাল্লা দিয়েই একটি বিপরীত বিশ্বাস দ্বারা নাস্তিকতাকেই আঁকড়ে ধরে।** 'বিশ্বাসের' সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন তাদের ক্ষেত্রেও হয়। আসলে, তারা যা বোঝে না তা মানতে পারে না। কিংবা যা মানলে তাদের ক্ষতি হবে, ভোগ-লালসায় ব্যাঘাত হবে, তা তারা মানতে পারে না। তাই আল্লাহ সূরা **সাবা** আয়াত ৩৪-এ বলছেন:

> *কোনো জনপদে যখনই আমি কোনো সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখনই সেখানকার বিত্তশালী লোকেরা বলেছে - তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, আমরা তা মানি না।*

বিনা বাক্য ব্যয়ে, বিনা যুক্তিতে তারা স্পষ্ট ক'রে ব'লে দেয় - আমরা মানি না। কারণ তারা বিত্তশালী। সত্যকে মানতে হলে তাদের লোকসান দিতে হবে। সূরা **জাসিয়া** আয়াত ২৩ - ২৬:

তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে [যেমন শখ] নিজের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? আর আল্লাহ জেনে-শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তার কানের ও তার অন্তরের ওপর সীল মেরে দিয়েছেন। আর তার চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে পথ দেখাবে? এর পরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? তারা বলে - আমাদের পার্থিব জীবনই তো একমাত্র জীবন। আমরা মরি এবং বাঁচি আর কালের প্রবাহেই কেবল আমাদের মৃত্যু হয়। - অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নাই। তারা তো শুধু অনুমান ক'রেই বলছে। আর যখন তাদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন এ ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো যুক্তি থাকে না যে, তারা বলে - তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে এস। - তুমি বল [হে মুহাম্মদ (স.)] আল্লাহই তোমাদের জীবন দান করেন, অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেন। তার পর তিনিই তোমাদের কেয়ামতের দিনে একত্র করবেন। এতে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

এই আয়াতগুলিতে উপস্থাপিত তথ্য এত বেশি সংক্ষিপ্ত এবং বহুমাত্রিক যে, তাকে যদি মানবীয় ভাষায় আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী আমরা সম্প্রসারিত ক'রে, সহজ সরল ক'রে বর্ণনামূলকভাবে লিখতাম, তাহলে হাজার হাজার লাইন লিখতে হতো। আল্লাহ রসূল (স.)-কে প্রশ্ন করছেন - তুমি কি দেখেছ সেই ব্যক্তিকে যে তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উপাস্য বানিয়েছে? তার মন যা বলে তাই সে করতে চায় এবং মনের চাওয়া পাওয়াই তার কাছে বড়? মনের চাওয়া পাওয়ার শখ মেটানোই তার জীবনের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব ব'লে সে মনে করেছে। তখন আল্লাহ বলছেন - আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তার কানের ওপর, তার চোখের ওপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন।

এখন, যেহেতু সে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্য হিসাবে বেছে নিয়েছে, সেহেতু আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, না-জেনে নয়। আবারও আল্লাহ কিন্তু না-জেনে তাকে পথভ্রষ্ট করেননি, জেনে শুনেই করেছেন। এ কথার অর্থ কী? এ কথার অর্থ হলো, আল্লাহ জেনেছেন যে সে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্য হিসেবে বেছে নিয়েছে। তখন আল্লাহ জেনেছেন যে, সে সচেতনভাবেই তার কামনা-বাসনার তাবেদারি করছে। এবং এই ভ্রষ্ট পথটাই সে কামনা করছে। ফলে আল্লাহ তার কাজে কোনো বাঁধা দিচ্ছেন না। এবং সে যে পথভ্রষ্ট হচ্ছে, এই কথাটি সে যদি নিজের মনের মধ্যে কয়েক বার বা কিছুকাল যাবৎ সঠিক আন্ত-রিকতা সহকারে বিশ্লেষণ করে, তাহলে হয়তো এ থেকে অনেক রহস্য উদঘাটন করতে পারবে এবং অবশেষে পথ পাবে। আল্লাহ বলছেন - আমি তাদের চোখের ওপর পর্দা রেখে দিয়েছি। এখন, এই পর্দা রেখে দেয়ার কারণটা কী? যেন তারা সত্য দেখতে না পায়। তাহলে, পর্দা যদি তিনি না রাখতেন, তাহলেই বা কী হতো? এমনটি কি হতে পারত না যে তারা সত্য পথে চলেনি আর এদিকে আল্লাহও তাদের অন্তরের বা চোখের ওপর পর্দা ফেলেননি? না, তা হতে পারত না। তাহলে চোখ আর অন্তরের স্বকীয়তা, সৃষ্টির স্বাধীনতা, এগুলির অর্থই থাকত না। আর যেহেতু তাদের অন্তরের ওপর পর্দা প'ড়ে গেছে, সেহেতু তাদের অন্তর সত্যকে দেখে না। আর তখনই তারা বলে - এই পার্থিব জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন; আমরা এখানেই মরি, এখানেই বাঁচি; সময়ের স্রোতে আসি, সময়ের স্রোতে চ'লে যাই। আমরা এখানে time machine জাতীয় কোনো কিছু যদি উদ্ভাবন করতে পারি, তাহলে হয়তো এ সময়ের বাধ ভেঙ্গে চ'লে যাব। কিন্তু সময় ছাড়া আমাদের ঝামেলা সৃষ্টি করার মতো আর কিছু নেই। তার কারণে আমরা সময়কে জয়

তারা তাকেই উপাস্য হিসেবে বেছে নিয়েছে, যা কিছু তারা দেখেছে। অর্থাৎ দৃশ্যমান জগৎ, যেমন নারী মদ শিশু অট্টালিকা বাড়ি গাড়ি এইসব - যা কিছু দেখা যায়, ছোঁয়া যায়, ধরা যায় - তাদের যাবতীয় মনোযোগকে আকর্ষণ ক'রে ফেলেছে, আর তখনই তাদের চোখে পর্দা প'ড়ে গিয়েছে, যে পর্দার কারণে তারা *শুধু পর্দাটিকেই দেখছে*, পর্দা ভেদ ক'রে আর কিছু দেখছে না, এমনকি পর্দার মধ্য দিয়ে দেখতে বাধ্য হচ্ছে ব'লে একথাও বুঝতে পারছে না যে তারা শুধু চোখের ময়লাকেই দেখছে।

করার জন্য যা কিছু করার, তা ক'রে যাচ্ছি। এবং তাদের যুক্তি পরকাল পর্যন্ত পৌঁছে না ব'লে তারা ধর্মকে নাজেহাল করার জন্য সারসরি ব'লে ফেলে - তোমাদের ধর্ম যদি সত্য হয়, তাহলে তোমরা আমাদের পূর্বপুরুষ - যারা বিগত হয়েছে - তাদেরকে এনে দেখাও। অর্থাৎ তারা যা কিছু দেখে না, তা বিশ্বাস করতে পারে না। কারণটা কী? কারণ, তারা তাকেই উপাস্য হিসেবে বেছে নিয়েছে, যা কিছু তারা দেখেছে। অর্থাৎ দৃশ্যমান জগৎ, যেমন নারী মদ শিশু অট্টালিকা বাড়ি গাড়ি এইসব - যা কিছু দেখা যায়, ছোঁয়া যায়, ধরা যায় - তাদের যাবতীয় মনোযোগকে আকর্ষণ ক'রে ফেলেছে, আর তখনই তাদের চোখে পর্দা প'ড়ে গিয়েছে, যে পর্দার কারণে তারা *শুধু পর্দাটিকেই দেখছে*, পর্দা ভেদ ক'রে আর কিছু দেখছে না, এমনকি পর্দার মধ্য দিয়ে দেখতে বাধ্য হচ্ছে ব'লে একথাও বুঝতে পারছে না যে তারা শুধু চোখের ময়লাকেই দেখছে।

যারা নাস্তিক তারা তাদের নিজেদের চোখের পর্দাটিই দেখে থাকে এবং তারা যা বলে তা যদি তারা নিজেরাই বিশ্লেষণ করে, তাহলে বুঝতে পারবে যে তাদের চোখে, তাদের অন্তরে পর্দা প'ড়ে গেছে। তবে মজার ব্যাপার হলো এই যে, এক পর্যায়ে তারা বলবে যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পর্দা প'ড়ে গেছে, এবং এই পর্দাই আমাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়; পর্দাই উপাস্য। কারণ এই পর্দার বাইরেই আমাদের জন্য দেখার মতো আর কিছু নেই।

তাদের মন ধ্বংসকে অস্বীকার করে। তারা এই দেহে বহাল থেকে এখানে বেঁচে থাকতে চায় - মৃত্যু পর্যন্ত, এবং মৃত্যুটাকেই ভুলে থাকতে চায়। ফলত এক অর্থে তারা বেঁচে থাকতে চায় অনন্তকাল পর্যন্ত , যার ফলে এই পৃথিবী নামক গ্রহটি বা দৃশ্যমান গোটা মহাবিশ্বটি যে নিজেই অসহায়, তা তারা ভাবতে চায় না।

অবিশ্বাসীগণ যখন আল্লাহর সত্যতা, কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাবলি যেমন পুনরুত্থান বেহেস্ত দোযখ ইত্যাদির ব্যাপারে শুনে থাকে, তখন তারা তা কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারে না। এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যের আলোকে তারা যখন মহাবিশ্বের গতিবিধি বিবর্তন ইত্যাদির ব্যাপারটি জানতে পারে, তখন তারা অনুমান-নির্ভর উপায়ে এইরূপও ব'লে থাকে যে, হয়তো পৃথিবী ধ্বংস হবে, কিন্তু সে ধ্বংস ঐরূপ কোনো ধ্বংস নয় যেন তা আগে থেকে পরিকল্পনা ক'রে রাখা হয়েছে; বরং বিভিন্ন মহাজাগতিক ঘটনার দ্বারা বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, ঠিক তেমনটি ঘটবে। এবং তা ঘটবে কার্যকারণ সূত্র ধ'রে, কোনো আল্লাহ তা ঘটাবেন তেমনটি নয়। এখানে, এই পর্যায়ে এসে, তারা পৃথিবী ধ্বংসের বিষয়টিকে কিছুটা মেনে নেয়। কিন্তু তাদের মন ধ্বংসকে অস্বীকার করে। তারা এই দেহে বহাল থেকে এখানে বেঁচে থাকতে চায় - মৃত্যু পর্যন্ত, এবং মৃত্যুটাকেই ভুলে থাকতে চায়। ফলত এক অর্থে তারা বেঁচে থাকতে চায় অনন্তকাল পর্যন্ত, যার ফলে এই পৃথিবী নামক গ্রহটি বা দৃশ্যমান গোটা মহাবিশ্বটি যে নিজেই অসহায়, তা তারা ভাবতে চায় না।

> *যখন আসমান বিদীর্ণ হবে, এবং নিজ রবের আদেশ পালন করবে, আর সে এরই যোগ্য, আর যখন জমিনকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং সে নিজের অভ্যন্তরে যা কিছু আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও খালি হয়ে পড়বে, এবং নিজ রবের আদেশ পালন করবে, আর সে এরূপই যোগ্য।*
>
> (সূরা **ইনশিকাক**, আয়াত ১-৫)

এখানে আল্লাহ স্পষ্টভাবে ব'লে দিচ্ছেন যে আসমান ও পৃথিবীর অন্য কোনো যেগ্যাতা না থাক, ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার যোগ্যতা তাদের রয়েছে। ধ্বংস হবার বিষয়টি যে তাদের স্বভাবের তাড়নার মধ্যে টাইম বোমার মতোই অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ চমৎকার (চমৎকার!) বাণীভঙ্গিতে এখানে তাই-ই বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহর বাণীভঙ্গির টেকনিক্যাল চরিত্রের দিকেও লক্ষ করুন। যেন গাণিতিক সূত্রকে মানবিক ভাষায় সমর্পণ করা হয়েছে।

তাদের জ্ঞান তাদের বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ব'লে যে বিষয়টি বোধ বা understanding দ্বারা বোঝার কথা বা জানার কথা ছিল, তা তারা জ্ঞান দ্বারা জানতে চায়। ফলে বিষয়টিকে তাদের কাছে নিছক অনুমান ব'লে মনে হয়।

তাদের জ্ঞান তাদের বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ব'লে যে বিষয়টি বোধ বা understanding দ্বারা বোঝার কথা বা জানার কথা ছিল, তা তারা জ্ঞান দ্বারা জানতে চায়। ফলে বিষয়টিকে তাদের কাছে নিছক অনুমান ব'লে মনে হয়। এই অনুমান-ক্রিয়া তাদের মস্তিষ্কেই ঘটে এবং তারা মস্তিষ্কেরই গতিবিধি অনুসারে জ্ঞান ও তথ্যকে প্রয়োগ ক'রে থাকে সত্য, তবে মস্তিষ্ক তাদেরকে নতুন কোনো তথ্য বা জ্ঞান দান করতে পারে না, এই জন্য যে, তাদের চিন্তা কোনদিকে প্রবাহিত হওয়া উচিৎ তা তারা আগে থেকেই নির্ধারিত ক'রে দিয়েছে। সূরা **জাসিয়া** আয়াত ৩২-৩৭। এখানে পরকালে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে আল্লাহ যে কথা বলবেন, তখন তারা যেভাবে জবাব দেবে তা উপস্থাপিত হয়েছেঃ

আর যখন বলা হতো - আল্লাহর ওয়াদা তো সত্য এবং কেয়ামত সংঘটিত হওয়াতে কোনোই সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলতে - আমরা জানি না কেয়ামত আবার কোন বস্তু। আমরা এটাকে কেবল অনুমান মনে করি এবং এ ব্যাপারে

আমরা নিশ্চিত নই। আর তখন তাদের কাছে যাবতীয় মন্দ কর্ম প্রকাশিত হয়ে পড়বে এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তা তাদেরকে ঘিরে ফেলবে - বলা হবে, [আল্লাহর তরফ থেকে] আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব, যেমন তোমরা ভুলে গিয়েছিলে এই দিনের সাক্ষাৎকারকে। তোমাদের বাসস্থান দোযখ। আর তোমাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। এটা এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে ঠাট্টা বিদ্রুপের বস্তু বানিয়েছিলে। এবং পার্থিব জীবন তোমাদরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। সুতরাং আজ তোমাদেরকে দোযখ থেকে বের করা হবে না। এবং তারা তওবা করার সুযোগও প্রাপ্ত হবে না। বস্তুত সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর, যিনি আসমানেরও রব, জমিনেরও রব, এবং সারা জাহানেরও রব। তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব গৌরব গরীমা জমিনে-আসমানে এবং তিনি প্রবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

আমরা দেখলাম এখানে আল্লাহ পরকালের বাস্তবতাকে বর্তমান ধ'রে নিয়ে কাফেররা অতীতে কী বলত তা বর্ণনা করছেন। এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। নাস্তিকদের মধ্যে যারা চিন্তাবিদ, জ্ঞানী, তারাও জগৎ সম্পর্কে একাধিক মতবাদ দিয়ে থাকে, এবং তা পোষণ করে। এবং যেহেতু সৃষ্টি তথা সৃষ্টির উৎসের দিকে একটি দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের জন্য তারা কোনো বিশ্বাসের আশ্রয় নেয় না, সচেতনভাবে বিশ্বাসকে অবলম্বন করে না, সেহেতু তারা একটু একটু ক'রে জ্ঞান দ্বারা, তথ্য থেকে প্রাপ্ত আপাত-সিদ্ধান্ত দ্বারা, এগোতে থাকে। জ্ঞান একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। একটি মানবের ক্ষেত্রে তার উৎপত্তি বিকাশ এবং এগিয়ে যাওয়া কথাটি আমরা প্রয়োগ করলেও, আসলে আমার নিজস্ব প্রতীতী অনুসারে, ব্যক্তি-মানবের ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রসঙ্গ খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা অর্থপূর্ণ নয়। বরং জ্ঞান হলো একটি মহাজাগতিক ঘটনা। জগৎ এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন পরিবর্তন পালাবদল

জ্ঞান একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। একটি মানবের ক্ষেত্রে তার উৎপত্তি বিকাশ এবং এগিয়ে যাওয়া কথাটি আমরা প্রয়োগ করলেও, আসলে আমার নিজস্ব প্রতীতী অনুসারে, ব্যক্তি-মানবের ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রসঙ্গ খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা অর্থপূর্ণ নয়। বরং জ্ঞান হলো একটি মহাজাগতিক ঘটনা। জগৎ এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন পরিবর্তন পালাবদল ও রূপবদলের মধ্য দিয়ে। এই ঘটনা যখন কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে সঠিক ইঙ্গিত (reference) সহ ধরা পড়ে, তখন যাবতীয় পরিবর্তনগুলির বিবৃতি (বা record) তার কাছে জ্ঞান হিসাবে প্রতীয়মান হয়।

ও রূপবদলের মধ্য দিয়ে। এই ঘটনা যখন কোনো পর্যবেক্ষকের কাছে সঠিক ইঙ্গিত (reference) সহ ধরা পড়ে, তখন যাবতীয় পরিবর্তনগুলির বিবৃতি (বা record) তার কাছে জ্ঞান হিসাবে প্রতীয়মান হয়। এই হলো জ্ঞানের বাহ্যিক (scientific বা) বিজ্ঞানসম্মত দিক, যা কেবল পর্যবেক্ষণ থেকেই আসা সম্ভব।

যেহেতু জ্ঞান সময়ের ধারাবাহিকতায় ঘটনাবলির ওপর প্রলম্বিত হতে হতে মানব মনে ধরা দেয়, সেহেতু যে টুকরো-টুকরো জ্ঞান অর্জিত হয়ে যায়, তার জন্যে একটি নির্দিষ্ট নাম দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে যায়। জ্ঞানশাস্ত্রে বা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এই রূপ নামকে concept, theory ইত্যাদি শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। যখন অবিশ্বাসী এবং পার্থিব অর্থে জ্ঞানীদেরকে বলা হয় যে কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন তারা তাদেরই জ্ঞান এবং চিন্তা-কাঠামো অনুযায়ী তা নিয়ে নতুনভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে। এবং এক পর্যায়ে গিয়ে যখন দেখে যে কিয়ামত নামক কোনো বিষয় তাদের concept বা তত্ত্বের ভাণ্ডারে নেই, এবং তাদের জানা অন্যান্য তথ্যের আলোকে সে ব্যাপারে কোনো অনুমানও করা যাচ্ছে না, তখন তারা এ কথাই ব'লে ওঠে যে, কেয়ামত আবার কোন বস্তু? আমরা তো ওটাকে কেবল আন্দাজ ব'লে মনে করি। এবং এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই। অর্থাৎ তারা নিশ্চয়তার সন্ধান ঠিকই

করে কিন্তু knowledge মানে যেহেতু certainty বা নিশ্চয়তা, এবং যেহেতু তারা knowledge এর স্তরে তথ্যগুলিকে খুঁজে পায়নি, সেহেতু তারা বলতে বাধ্য হয় যে, এ ব্যাপারে আমাদের কোনো certain knowledge নেই। আর যেহেতু আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে আমরা শুধু তাই অনুসরণ করব, তার প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ হব, যা আমাদের জ্ঞানে আছে, সেহেতু এ ব্যাপার আমরা অস্বীকার করি। আর কেয়ামতকে এইভাবে অবিশ্বাস করার অবকাশে তারা তাদের অনুভূতি মনের গোপন ইচ্ছা ভোগ-লালসার যত তৃষ্ণা সেখানে-এখানে মিটিয়ে ফেলেছিল, তখন সেগুলি বের হয়ে পড়বে। তাই আল্লাহ্ বলছেন - আর তখন তাদের কাছে তাদের যাবতীয় খারাপ কাজ প্রকাশ হয়ে পড়বে। কেন প্রকাশ হয়ে পড়বে? কারণ তারা সেগুলি ঘটিয়েছিল পৃথিবীতে। কেন ঘটিয়েছিল? কারণ তারা কেয়ামত নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত আর ঠাট্টা বিদ্রুপ করার কারণেই বিষয়টি তাদের মনে স্থান গাড়তে পারেনি। জ্ঞান বোধ প্রজ্ঞা স্বজ্ঞার স্তরে অনুভূত হতে পারেনি - ফলে তারা তাদের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি।

মূলত কেয়ামতকে তারা অস্বীকার করা শুরু করেছিল অহংকারের কারণে। এবং পার্থিব ভোগ-লালসা বিঘ্নিত হবে এই ভয়ে। এবং এই শুরুটা ছিল একেবারেই আবেগ-নির্ভর, মনের কু-ইচ্ছা-নির্ভর। এবং ফলে এই শুরু একবার ঘ'টে গেলে তার পর তারা যতই তাদের মেধা-মননকে প্রয়োগ করুক না কেন, সঠিক সিদ্ধান্তে যে উপনীত হতে পারবে না, এটাই তো স্বাভাবিক।

মূলত কেয়ামতকে তারা অস্বীকার করা শুরু করেছিল অহংকারের কারণে। এবং পার্থিব ভোগ-লালসা বিঘ্নিত হবে এই ভয়ে। এবং এই শুরুটা ছিল একেবারেই আবেগ-নির্ভর, মনের কু-ইচ্ছা-নির্ভর। এবং ফলে এই শুরু একবার ঘ'টে গেলে তার পর তারা যতই তাদের মেধা-মননকে প্রয়োগ করুক না কেন, সঠিক সিদ্ধান্তে যে উপনীত হতে পারবে না, এটাই তো স্বাভাবিক। জ্ঞানশাস্ত্রে যুক্তিবিদ্যায় এবং reasoning নিয়ে আলোচনা করার

ক্ষেত্রে আমরা তো এই বিষয়গুলিই আলোচনা ক'রে থাকি যে, কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা ক'রে যে ফল পাওয়া যাবে, তা ঐ বিষয় নিয়ে চিন্তা করার আগে যে assumption বা পূর্বানুমান গ্রহণ করা হয়েছিল, তা দ্বারা নির্ধারিত হবে। তাদের অপরাধ-প্রবণতা, ভোগ-লালসার ইচ্ছা মেটাবার জন্য অনুভূতিকে প্রদত্ত প্রশ্রয় তাদের দৃষ্টিকে চিরতরে একটি বিশেষ দিকে নিবদ্ধ ক'রে ফেলেছিল। আর মানুষের দৃষ্টি মানেই তার চিন্তার শুরু বিন্দু। চিন্তা যদি ভুল স্থানে শুরু হয়, তাহলে তা সূক্ষ্মভাবে, বৈধ উপায়ে এগিয়ে গেলেও, ভুল স্থানে গিয়ে শেষ হয়। কারণ চিন্তার

কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা ক'রে যে ফল পাওয়া যাবে, তা ঐ বিষয় নিয়ে চিন্তা করার আগে যে assumption বা পূর্বানুমান গ্রহণ করা হয়েছিল, তা দ্বারা নির্ধারিত হবে।

এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি একেবারেই যান্ত্রিক এবং বিশুদ্ধ। এ কারণেই তার শুরুর স্থান দ্বারা তার সমাপ্তির স্থান নির্ধারিত হবে - এগিয়ে যাওয়া সঠিক হবে ব'লে ভুল গন্তব্যের কারণে বিপথগমণও সহজ হবে।

> *নিশ্চয় তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের। অতএব যে ব্যক্তি দান করে এবং মোত্তাকী হয়, এবং যা উত্তম তা সত্য ব'লে বিশ্বাস করে, আমি অবশ্যই তার জন্য সহজ করে দিব সুখ-শান্তির পথ। আর যে ব্যক্তি কার্পণ্য করে এবং নিজেকে বেপরোয়া মনে করে, এবং যা উত্তম তা অস্বীকার করে, আমি অবশ্যই তার জন্য সহজ ক'রে দিব কঠোর পরিণামের পথ। যখন সে ধ্বংসের মধ্যে পতিত হবে, তখন আর ধন-সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না।* (সূরা **লাইল**, আয়াত ১-১১)

তাই আল্লাহ বলছেন - সূরা **জাসিয়া** আয়াত ৩১ এঃ
ধর্ম, ধর্মাচরণ ইত্যাদি না হয় কেউ না বুঝল, কিন্তু সে কেমন লোক তা বোঝা যায় সে উত্তম বা সুন্দরকে গ্রহণ না কি বর্জন করল তা থেকে। যে সুন্দরকে ত্যাগ করে, সে ধর্মকে মানলেও তো কোনো লাভ হতো না।

আর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে বলা হবে - তোমাদের কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ ক'রে শোনানো হতো না কি? তখন তোমরা অহংকার করেছিলে। আর তোমরা ছিলে বড়ই অপরাধপ্রবণ লোক।

আল্লাহকে তো অন্য কোনো ভাবে স্মরণ করা যায় না - আল্লাহকে স্মরণ করতে হলে কিয়ামত, পৃথিবীর ধ্বংস, পরকালে বিচার দিনের হিসাব-নিকাশ ইত্যাদিও স্মরণ করতে হয়।

আল্লাহ এখানে স্পষ্ট ক'রেই বলে দিচ্ছেন যে, তাদের অহংকারের কারণেই তারা আয়াতগুলিকে, তার মর্মগুলিকে বিকর্ষণ করত। আর এই অহংকার কোত্থেকে এসেছিল? তাদের অপরাধ-প্রবণতা থেকে। তাদের অপরাধ-প্রবণতার কারণে তারা এখানে তাদের স্বেচ্ছাচারিতা প্রয়োগ করতে চাইত। আর এই সেচ্ছাচারিতা পৃথিবীতে প্রয়োগ করতে চাইত ব'লে তারা পৃথিবীটিকে সুন্দর ক'রে গড়ে নিতে চাইত। তাদের মনের মতো ক'রে এখানে তারা যোগ্যতা অর্জন করতে চাইত, আর এভাবেই তারা পার্থিব অর্থে যোগ্যতায় শক্তিশালী প্রবল cultured শিক্ষিত জ্ঞানী বুদ্ধিমান হয়ে গেলে সেই অবস্থাকে ধ'রে রাখার প্রয়োজনে অহংকার নামক পর্দায় নিজেদেরকে মুড়ে ফেলত, যে পর্দা আর তারা সরাতে চাইত না, এবং এই পর্দা বাইরের সমস্ত আলোকে ঠিকরে ফেরৎ দিত, যা আর ভেতরে প্রবেশ করতে পারত না। এভাবে, এই পর্দার অন্তরালে নিজেদেরকে লুকিয়ে, তারা আল্লাহ থেকে দূরে ছিল। কারণ আল্লাহকে তো অন্য কোনো ভাবে স্মরণ করা যায় না - আল্লাহকে স্মরণ করতে হলে কিয়ামত, পৃথিবীর ধ্বংস, পরকালে বিচার দিনের হিসাব-নিকাশ ইত্যাদিও স্মরণ করতে হয়।

একটি মজার বিষয় এখানে আমরা লক্ষ করতে পারি। আমাদের কারো যদি অভিজ্ঞতা থেকে থাকে, তাহলে অবশ্যই প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারাই বুঝতে পারব যে, নাস্তিকদের মধ্যেও কেউ কেউ আল্লাহ নিয়ে চর্চা করেন। কিন্তু তা নেহায়েত আধ্যাত্মিক ধাঁচের। শরীয়তকে, ধর্মের মূল

ভিত গুলিকে, তথা ধর্মের আবশ্যিক বিশ্বাসগুলিকে অবিশ্বাস ক'রে, তারা শুধু আল্লাহকে গ্রহণ করে। অর্থাৎ আল্লাহকে যেটুকু পরিমাণে গ্রহণ করলে নিজের ওপর কোনো দায়ভার বর্তাবে না, তারা সেটুকুই ক'রে থাকে। আর এভাবেই তারা কার্যকরীভাবে আল্লাহকে ভুলে যায়। আর তাই আল্লাহ বলছেন যে, আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব। তোমরা ভুলে থেকেছিলে এ দিনের সাক্ষাৎকে। বেশ। কিন্তু তারা ভুলে যায় ব'লে আল্লাহ কেন পরকালে তারই প্রতিশোধ হিসেবে তাদেরকে ভুলে যাবেন? তার কারণ, তিনি বলছেন - এটা এই জন্য যে, তোমরা আল্লাহর আয়াত সমূহকে ঠাট্টা বিদ্রুপের বস্তু বানিয়েছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছিল। বেশ। তার কারণ হিসেবে দেখানো হচ্ছে - পার্থিব জীবনে তাদের চোখ, তাদের দৃষ্টি পার্থিবজীবনের প্রতি নিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল,আঠার মতো লেগে গিয়েছিল। আর এ জন্যে তখন আল্লাহ তাদের ভুলে যাবেন। কিন্তু আল্লাহ কি না ভুললেও পারতেন না? বিষয়টিকে একটু গভীরভাবে, অত্যন্ত আন্তরিকভাবে এবং সততার সাথে চিন্তা করলে এখানেই বুঝতে পারা যাবে যে, কোরআন কোনো মানুষের রচনা নয়। মানুষ কোরআন রচনা করলে সেই রচনার মধ্যে উদ্ভাবিত আল্লাহ কারো বিপথে যাওয়ার দোষ নিজের ঘাড়ে নিত না। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে পরোয়া করেন না। তারা অহংকারস্বরূপ, পার্থিবজীবনকে বেছে নেওয়ার সুবিধাস্বরূপ, আল্লাহকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত। এবং নিজেরা প্রশংসা চাইত। নিজেদের মতবাদকে, নিজেদের way of life কে প্রশংসিত ব'লে মনে করত। তাই অবশেষে আল্লাহ বলছেন, আয়াত ৩৬-এ:

বস্তুত সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর।

অবিশ্বাসীরা সেদিন	সব প্রশংসা আল্লাহর। তারা যতই ঠাট্টা
এমন ফাঁদে আটকে	বিদ্রুপ করত না কেন, তোমরা যতই ঠাট্টা
যাবে যে ফাঁদ থেকে	বিদ্রুপ করতে পার না কেন। এ তো গেল
তারা বেরোতে পারবে	এক স্তরের অর্থ। কিন্তু এর পরে আরেকটু

না। সেই ফাঁদ মূলত তাদের নিজেদেরই পাতা ফাঁদ।

কথা আছে। আল্লাহ তার পরে বলছেন - তিনি জমিনেরও রব, সারা জাহানেরও রব, পৃথিবীরও রব ছিলেন। এবং তার পরে আবার তিনি বলছেন - তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব গৌরব গরিমা আসমানে ও জমিনে। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের way of life বা জীবন বিধানকে, জীবন যাপনের উপায়কে, ভালো মনে ক'রে নিজেদেরকে প্রশংসিত মনে করতে এবং আমার জীবন-বিধানকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে। কিন্তু ওখানেও প্রশংসা আমারই। এক অর্থে, তোমার বিবেকের reference অনুযায়ী ঠাট্টা বিদ্রুপ আমার প্রাপ্য ছিল না। প্রশংসা আমারই প্রাপ্য ছিল। যদিও তোমরা তা করনি। আবার, আমার দৃষ্টিতে তোমরা যে নিজেদেরকে প্রশংসিত মনে করতে, সেই প্রশংসা মূলত তোমরা আমাকেই করতে চাইতে, যদিও তোমরা তা বুঝতে না। এই কথাটির মর্ম যদি আমরা কেউ কখনও বুঝতে পারি, গভীর হৃদয়ঙ্গম আত্মসমর্পণ ও অন্তরের সত্তা দিয়ে, তাহলে বুঝতে পারব কেন অবিশ্বাসীরা সেদিন এমন ফাঁদে আটকে যাবে যে ফাঁদ থেকে তারা বেরোতে পারবে না। সেই ফাঁদ মূলত তাদের নিজেদেরই পাতা ফাঁদ।

কেউ যদি আল্লাহকে অস্বীকার করে, তাহলে সে নিজের জন্যে নিজে ফাঁদ পাতে - এ কথা কেন বলা হচ্ছে? তাহলে আল্লাহকে অস্বীকার করা বলতে কী বোঝায়? মূলত আল্লাহকে অস্বীকার করা বলতে বোঝায় নিজেকে অস্বীকার করা। তাহলে আল্লাহ মানে কী? কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরও খুব সহজে দিতে হবে - 'আল্লাহ মানে কী?' এভাবে সন্ধান করলে কখনোই অন্তরে কোনো অর্থময়তা সৃষ্টি হবে না। সুতরাং আল্লাহকে অস্বীকার করলে কী কী অস্বীকার করা হয়? - এভাবে ভাবতে হবে। আল্লাহকে অস্বীকার করলে নিজেরই ধারাবাহিকতা - ইহকাল + মৃত্যু + পরকাল - তথা অনন্তকালের অস্তিত্বের ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করা হয়। আর কেউ যদি নিজেকে অস্বীকার করে, তাহলে সে যা কিছুকে ঠাট্টা করত তা মূলত তারই অস্তিত্বের অজানা অদেখা সার্বিক রূপ। এবং সে তখন যা কিছুর প্রশংসা করত তা মূলত তারই অস্তিত্বের

একটি মাত্র অংশ। কিন্তু, সে প্রশংসা করতে চাইত মূলত দৃশ্য অদৃশ্য সবকিছুর কেন্দ্রকে। অথচ তারা প'ড়ে থাকত সামান্য একটি পরিধির সামান্য একটি জগৎ নিয়ে। তারা এতই বোকা ছিল যে অল্পেই সন্তুষ্ট, নেশাসক্ত হয়ে গিয়েছিল, প্রকৃত প্রাচুর্যের জন্য অপেক্ষা করতে পারেনি।

তারা এতই বোকা ছিল যে অল্পেই সন্তুষ্ট, নেশাসক্ত হয়ে গিয়েছিল, প্রকৃত প্রাচুর্যের জন্য অপেক্ষা করতে পারেনি।

এক কথায়, আল্লাহ্ এই আয়াতগুলিতে যা বলছেন তা একটি পূর্ণাঙ্গতা নির্মাণ করেছে। তিনি বলছেন যে, পার্থিব ভোগ-লালসা নিশ্চিত করার জন্য অবিশ্বাসীরা আমাকে অবিশ্বাস করত। আর এই ভোগ-লালসা নিশ্চিত করতে গিয়ে তারা পৃথিবীটাকে প্রতিষ্ঠিত করত। সেখানে নিজেরা যোগ্যতা অর্জন করত। ফলে বিনয় নম্রতা বিশ্বাস এইগুলিকে তারা তাদের অহংকার দ্বারা বিকর্ষণ করত। ফলে তারা মূলত তাদেরই পূর্ণাঙ্গতা, ধারাবাহিকতা ও একত্বকে অস্বীকার করত। এবং যখন আমার সঙ্গে তাদের দেখা হবে, এ কারণে তখন তাদের অহংকারের চাদরের মোড়ক আমার থেকে তাদেরকে দূরে আটকে রাখবে। তারা আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। আর আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মানেই নিজেদের মঙ্গল থেকে, নিজেদের প্রকৃত অনন্ত স্বাধীনতা থেকে, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া। ফলে তারা যে অহংকারের আবরণ তাদের চারপাশে নির্মাণ করেছিল, তাদের সমস্ত কাজকর্ম যে ফল সৃষ্টি করেছে, তা সেই মোড়কের মধ্যেই বাঁধা পড়ে গেছে, এবং তারা ছাড়া তা আর কেউ ভোগ করবে না, এবং তারা তা ভোগ না ক'রেও পারবে না। অর্থাৎ অহংকারের আবদ্ধ ঘর যারা নির্মাণ করেছে, তাতে তাদেরকেই থাকতে হবে এবং তাতে জীবনযাপন এবং ভোগের উপকরণ হিসেবে কেবল তাইই রয়েছে যা কেবল তাদেরই কৃত কর্মফল অনুযায়ী সৃষ্ট হয়েছে।

আমরা আগেই বলেছিলাম যে ধর্মগ্রন্থগুলি এমনভাবে প্রকাশিত যে তা মানুষকে জ্ঞানী ক'রে তুলতে চায়। একই সাথে তার ব্যক্তিত্বের যাবতীয় স্তরের প্রতি পরিস্থিতি, অনুভূতি ও সময়ের দাবি অনুযায়ী আঘাতও করে। আমরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে জ্ঞান অর্জন করি, তা করতে

গিয়ে আমাদেরকে শুধু তথ্য গ্রহণ করতে হয় এবং অনুশীলন দ্বারা এই তথ্যকে বোধের মধ্যে তত্ত্বীয় কাঠামোর আলোকে একটি অর্থময়তার আবহে গ্রাস ক'রে নিতে হয়। সে জ্ঞান এমন কিছু নয় যার সঙ্গে আচরণ জড়িত করতে হবে। অর্থাৎ যা পালন করতে হবে। অর্থাৎ যাকে *উপদেশ* আকারে নিতে হবে। কিন্তু আল্লাহ যখন কোনো ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে মানুষকে সত্য কথাগুলি শোনান, তখন সে কথাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে *আদেশ নিষেধ উপদেশ* আকারে প্রকাশিত হয়। আমরা একটু মাথা খাটালে বুঝতে পারব যে আমরা যত ধরনের বাক্য গঠন করি তা মূলত আমাদের মনের *প্রকাশ*। আমরা *কী কী* প্রকাশ ক'রে থাকি? তথ্য প্রকাশ ক'রে থাকি, *জানার আগ্রহ* প্রকাশ ক'রে থাকি, *আবেগ* প্রকাশ ক'রে থাকি, *কামনা* প্রকাশ ক'রে থাকি, অতীতের *আক্ষেপ* প্রকাশ ক'রে থাকি, শর্ত প্রকাশ ক'রে থাকি, ইত্যাদি। আমরা কী প্রকাশ করব তা অনুসারে নির্ধারিত হয় আমরা তা কিভাবে প্রকাশ করব। যেমন, আমরা যখন *তথ্য* প্রকাশ করি, তখন যে-বাক্য গঠন করি, তাকে বলি assertive sentence বা বিবৃতিমূলক বাক্য। আমরা যখন *জানার আগ্রহ* প্রকাশ করি, তখন যে বাক্য গঠন করি, তাকে বলি question বা interrogative sentence বা প্রশ্নমূলক বাক্য। আমরা যখন *অন্যের ইচ্ছাকে প্রভাবিত করার ইচ্ছা* প্রকাশ করি, তখন imperative sentence বা আদেশমূলক, উপদেশমূলক বাক্য গঠন করি ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, মানব জ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে একটি মাত্র বাক্যের ব্যবহারের বা বিশ্লেষণের ওপর। তা হলো তথ্য প্রকাশ। প্রকৃতিজগৎকে একটি বিশাল তথ্যের গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা যায়, যেখানে কিছু তথ্য আমরা যখন সমাজে অনাহারী অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে দেখি, তখন তাদের সংখ্যা গণনা করি, তাদের দেহের গড়ন, পুষ্টির পরিমাণও গণনা করি ইত্যাদি। বিবৃতিমূলক বাক্য দ্বারা আমরা কেবল তাদের অবস্থাগুলিকে চিত্রিত করি। এই প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তবে এটি

পূর্ণাঙ্গ নয়। আমরা শুধু বিবৃতিমূলক বাক্য থেকেই জ্ঞান অর্জন করছি, যার কারণে অন্যান্য বাক্যগুলি থেকে যে জ্ঞানার্জনের কথা ছিল, তা আমাদের দ্বারা সাধিত হচ্ছে না। ফলে আমাদের জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না। আর এই কারণেই আমাদের জ্ঞান, আমাদের বোধ, বিশ্বাস, ইত্যাদি আমাদের ভালোবাসা ও অঙ্গীকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

অস্তিত্বের রীতিতেই প্রকাশিত। এই তথ্যগুলিকে বিজ্ঞানীগণ বিবৃতিমূলক বাক্যের মাধ্যমে, সমীকরণের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করেন, এবং তা থেকে তারা বিজ্ঞানসম্মত অনুমানক্রিয়ার পথ ধ'রে অন্যান্য এমন তথ্য আবিষ্কার করেন যা আপাতাতভাবে অজানা ছিল বা লুকায়িত ছিল। আমরা যখন সমাজে অনাহারী অভাবগ্রস্ত লোকদেরকে দেখি, তখন তাদের সংখ্যা গণনা করি, তাদের দেহের গড়ন, পুষ্টির পরিমাণও গণনা করি ইত্যাদি। বিবৃতিমূলক বাক্য দ্বারা আমরা কেবল তাদের অবস্থাগুলিকে চিত্রিত করি। এই প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তবে এটি পূর্ণাঙ্গ নয়। আমরা শুধু বিবৃতিমূলক বাক্য থেকেই জ্ঞান অর্জন করছি, যার কারণে অন্যান্য বাক্যগুলি থেকে যে জ্ঞানার্জনের কথা ছিল, তা আমাদের দ্বারা সাধিত হচ্ছে না। ফলে আমাদের জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না। আর এই কারণেই আমাদের জ্ঞান, আমাদের বোধ, বিশ্বাস, ইত্যাদি আমাদের ভালোবাসা ও অঙ্গীকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। যেমন, আমরা গরীবের সংখ্যা গণনা করি, পরিসংখ্যান নামক জ্ঞানের একটি শাখায় সেই সংখ্যা লিপিবদ্ধ করি। গরীব আর গরীব থাকে না। গরীব হয়ে যায় গবেষণার বস্তু। কিন্তু গরীব যখন 'উহু!' ক'রে ওঠে খিদের যন্ত্রণায়, যখন চিৎকার ক'রে উঠে আন্তরিক আকুতি জানায় খাবারের জন্য, নির্যাতিত যখন ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রত্যাশায় আকুল আবেদন জানায়, বা না পেয়ে হতাশ হয়, তখন তারা যে আবেগসূচক বাক্যগুলিকে প্রকাশ করে, যে আক্ষেপসূচক বাক্যগুলিকে প্রকাশ করে, যে কামনাসূচক বাক্যগুলিকে প্রকাশ করে, সরাসরি তা থেকে আমরা কোনো জ্ঞান গ্রহণ করি না; তা থেকে আমরা যখনই জ্ঞান সংগ্রহ করতে যাই, তখন সেই বাক্যগুলিকে প্রথমে বিবৃতিমূলক বাক্যে রূপান্তরিত ক'রে নিই।

আদেশ উপদেশ নিষেধ এই জাতীয় বাক্যগুলি হলো এমন যার সূত্র ধ'রে মানুষে মানুষে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু সচরাচর যার দ্বারা মানুষের মধ্যে জ্ঞানবর্ধন বা knowledge development ঘটে না। মানুষকে কোনো আদেশ করা হলে সে যদি তা পালন করে, তো করল, তার বিনিময় সে চায় - নিজের কাছে হোক, অপরের কাছে হোক, এখন হোক, ভবিষ্যতে হোক; যদি পালন না করে, তাহলে হয়তো একটি ভুল বোঝাবুঝির শুরু হয়। এভাবেই আদেশ অনুরোধমূলক বাক্যগুলি দ্বারা সমাজে একে অপরের সংগে সম্পর্কের রীতি নির্ধারিত হয়। বিশেষত যারা মনে করে যে ইতিমধ্যে তারা প্রচুর জ্ঞান অর্জন ক'রে ফেলেছে, তাদের ক্ষেত্রে অপরের জ্ঞান আদেশ উপদেশ কোনোটাই গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। কারণ তাদের এই মনে করার সাথে তাদের জ্ঞানের পরিমাণ সংযুক্ত হয়ে তাদের চারদিকে অহংকারের মোটা চাদর রচনা করে। ফলে তারা আদেশ উপদেশমূলক গ্রন্থ তথা ধর্মগ্রন্থ নিয়ে যখন চিন্তা করে, সে চিন্তা যতই কসরৎপূর্ণ হোক, যতই সময়সাপেক্ষ হোক, তা থেকে তারা সত্যে উপনীত হতে পারে না। যদি কখনও পারে, তাহলে সে সত্য তাদের কাছে সফলতা-বিফলতা আকারেই দেখা দেয়। যেমন, ইসলাম আজ সারা পৃথিবীতে যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে তা তাদের জন্য আতংকজনক। কিন্তু তারা আবার এরূপ মনে করে যে, এই ইসলামের মতবাদ যদি আমরা মেনে নিতে পারতাম, এবং তার ফলে যদি নিজেরাই এই রকম জাগরণ সৃষ্টি করতে পারতাম, তাহলে তো অবশ্যই ভালো হতো। অর্থাৎ তারা মূল জিনিসটিকে ভুলে গেছে, ফলে কোনোকিছু যদি সফলতা অর্জন করে, তাহলে তারা অমনি সেই ব্যাহ্যিক সফলতাটুকুকে পছন্দ ক'রে ফেলে। এবং সেই সফলতা যদি তাদের সফলতার বিপক্ষে যায়, তাহলে তার বিরুদ্ধে চ'লে যায়। আর যদি তারা মনে করে যে এই জাতীয় ঘটনাবলি - ধর্মগ্রন্থ, গ্রন্থ অবতরণ, তত্ত্বকথা ইত্যাদি সত্য হোক মিথ্যা হোক - আমরা যদি এইরূপ কিছু উদ্ভাবন করতে পারি, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট। তাতে আমাদের অহংকারের সৃষ্টির বাসনা মিটবে। তাই আল্লাহ সূরা **কিয়ামা** আয়াত ৫২ তে বলছেন:

বরং তাদের প্রত্যেকেই কামনা করে যে তাকে একটি ক'রে উন্মুক্ত গ্রন্থ প্রদান করা হোক।

কোন এক মোহাম্মদের (স.) প্রতি গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে, আর তাই আমাদের সবাইকে আঁকড়ে ধরতে হবে, এটা আমরা চাই না। আমরা চাই আমাদের প্রত্যেককে একটা একটা ক'রে গ্রন্থ দেয়া হবে, যে গ্রন্থ নিয়ে আমরা প্রত্যেকে বলব যে, আমারও গ্রন্থ আছে। আমিও গ্রন্থ পেয়েছি। আমার জন্য আলাদা ক'রে আল্লাহ special ধর্ম অবতীর্ণ করেছেন।

অহংকারের রীতি ঠিক এই রকমের। তা বিচ্ছিন্নতাবাদী আচরণ করে এবং একই সঙ্গে প্রতিটি বিচ্ছিন্ন অহংকার নিজের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গতার অনুসন্ধান করে। এবং তা রচনাও ক'রে নেয়। এটাই তাওহীদের একটি গূঢ় রহস্য। তাওহীদেরই একটি প্রতিফলন-নির্ভর ফলশ্রুতি। এবং সবচেয়ে কঠিন ফাঁদ।

বলা বাহুল্য, অহংকারের রীতি ঠিক এই রকমের। তা বিচ্ছিন্নতাবাদী আচরণ করে এবং একই সঙ্গে প্রতিটি বিচ্ছিন্ন অহংকার নিজের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গতার অনুসন্ধান করে। এবং তা রচনাও ক'রে নেয়। এটাই তাওহীদের একটি গূঢ় রহস্য। তাওহীদেরই একটি প্রতিফলন-নির্ভর ফলশ্রুতি। এবং সবচেয়ে কঠিন ফাঁদ। তাদের এই আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা তাদেরকে পার্থিব অর্থে জ্ঞানার্জনেও বাধ্য করে। এবং সাধ্যমতো বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন ক'রে তারা জ্ঞানী হিসাবে সাব্যস্ত হতেও চায়। সেই জ্ঞানকে ব্যবহার ক'রে এমন কিছু করতে চায়, যা দ্বারা তারাই জ্ঞানী হিসেবে চিহ্নিত হবে ব'লে মনে করে। অথচ জ্ঞান নিজেই যে জ্ঞানের পুরস্কার তা তারা ভুলে যায়, যদিও মাঝে মাঝে তারা মুখ থেকে তা ব'লে থাকে এবং তখন এক পর্যায়ে তারা কেউ কেউ বিভিন্ন স্টাইলে দাঁড়ি রাখে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো, তারা লম্বা

চুল রাখে - জ্ঞানীর চুল ব'লে যা সচরাচর পরিচিত। তাই আল্লাহ বলছেন সূরা **বায়্যিনা** আয়াত ১৩ - ১৬:

> *তুমি কি লক্ষ করেছ যে যদি সে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে কি সে জানে না যে আল্লাহ তো সব কিছু দেখেন? তার এই রূপ করা কখনও উচিৎ নয়। যদি সে এই রূপ করা থেকে ফিরে না আসে, তাহলে আমি অবশ্যই তাকে ললাটের কেশগুচ্ছ ধ'রে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাব, যে কেশগুচ্ছ মিথ্যাচারী পাপাচারীর।*

অর্থাৎ এ কথাই এখানে আল্লাহ চিহ্নিত ক'রে বলছেন - যে কেশগুচ্ছ মিথ্যাচারীর এবং পাপাচারীর নিজস্ব স্টাইলের প্রকাশ বহন করে, সে কেশগুচ্ছ ধ'রেই অনায়াসে আমি তাদেরকে টেনে নিয়ে যাব। এখানে ১৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ যে প্রশ্নটি করছেন তা অত্যন্ত ইঙ্গিতবহ:

> *তবে কি সে জানে না যে আল্লাহ সব কিছু দেখেন?*

আমরা যদি একটু সাবধানে এগোতে চাই, এবং কোরআনের কোন আয়াতের কী অর্থ কেন করছি, কোন কারণে একটি বিশেষ অর্থের প্রতি আমার দৃষ্টি চ'লে যাচ্ছে, তার দিকে সচেতন থাকি, তাহলে হয়তো একটি চমৎকার জিনিস লক্ষ করব। এখানে আল্লাহ তাদের ব্যাপারে প্রশ্ন করছেন যে - তারা কি জানে না যে, আল্লাহ সবকিছু দেখেন? তার মানেই হলো এই যে, কোনো না কোনো উপায়ে এই প্রশ্নটি তাদের কাছে গিয়েই উপস্থিত হবে। এবং আল্লাহ সরাসরি তাদেরকে প্রশ্ন করছেন না - এরূপ বলছেন না যে, 'তোমরা কি জান না?' যেহেতু তারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে, যেহেতু তারা আল্লাহকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে অহংকারের পর্দার অন্তরালে রেখেছে, সেহেতু আল্লাহ তাদেরকে *সরাসরি* প্রশ্ন করছেন না। যে কারণে তারা এখানে যেভাবে আল্লাহকে

ভুলে গিয়েছে, সেভাবে আল্লাহও পরকালে তাদেরকে ভুলে যাবেন, এরূপ কথাও তো আমরা একটু আগে জেনেছি, ঠিক একই বিকর্ষণের পথ ধ'রে আল্লাহ এখানে তাদেরকে কতকটা পরোক্ষতার মধ্যে রেখেই তাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন রসূল (স.)-কে, যে, 'তারা' কি জানেনা যে, আল্লাহ সব দেখেন? এই প্রশ্নটি যদি হুবহু কোরআনের ভাষায় তাদের কাছে উপস্থাপন না ক'রে ব্যক্তিগত ভাষায় তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়, তাহলে তা এইভাবে প্রকাশ পাবে - 'তোমরা' কি জান না যে আল্লাহ সব দেখেন? - তখন 'তোমরা-আমরা' এর ব্যবধান তাদেরকে আরো বেশি অহংকারী ক'রে তুলবে। যে কারণে আল্লাহ এভাবেই বলছেন - তবে 'তারা' কি জানে না যে আল্লাহ সবকিছু দেখেন?

কিন্তু আল্লাহ এই প্রশ্ন যাকে করছেন, জবাব কি তার কাছে চাচ্ছেন? রসূল (স.)-কে কেন তিনি এই প্রশ্ন করছেন? তিনি অবশ্যই এর জবাব চাচ্ছেন না। তাহলে কেন তিনি এই প্রশ্ন করছেন? প্রশ্ন করছেন এই জন্যে যে, তিনি কাফেরদের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরোক্ষ উপায়টিকে সূত্রবদ্ধ ক'রে record ক'রে রেখেছেন। তারা যদি কখনও কোরআন পড়ে, তাহলে তারা এই প্রশ্নটির সম্মুখীন হবে। আবার তাদের প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হচ্ছে সরাসরি রসূল (স.) এর সঙ্গে কথা বলার সময়ে। কিংবা বিশ্বাসীদের সঙ্গে আলাপ করার সময়ে। অর্থাৎ আল্লাহ তাকিয়ে আছেন বিশ্বাসীদের দিকে - অথচ প্রশ্ন করছেন তাদের (অবিশ্বাসীদের) বোধ সম্বন্ধে। এ কারণে বিশ্বাসীদের জন্যও এটি বাধ্যতামূলক হয়ে যায় এই প্রশ্নের ইঙ্গিত অনুসন্ধান করা।

আল্লাহ যখনই বলেন - তারা কি জানে না? তখনই তিনি অবশ্যই এ কথা ইঙ্গিত করেন যে, অন্তরের কোনো একটি স্তরে তারা তা *জানে*। কী জানে? তারা জানে যে, আল্লাহ সব দেখেন। এবং একজন বিশ্বাসী তার ভাবনাকে এখান থেকে এভাবে শুরু করবেন যে, তারা যদি সব জানেও, তাহলে তারা কেন দূরে থাকে? তখন তার উত্তর পাওয়া যাবে। কারণ

তারা অস্বীকার করে, অমান্য করে। তারা যদি বলে যে, 'আমরা জানি', তাহলে তা মানা বা পালন করা তাদের জন্য তাদেরই নিয়মে বাদ্ধতামূলক হয়ে যাবে। আবার অবিশ্বাসী নিজেই যদি এই প্রশ্ন নিয়ে ভাবে, এবং তার মধ্যে যদি কোনো ভালো সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে - যেমনটি অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে, তাহলে এই প্রশ্নের মধ্যেই তিনি আলোর ঝলকানি দেখবেন। কারণ তিনি তার অন্তরে অনুসন্ধানের পর দেখতে পাবেন যে, সত্যিই তো। আমি তো তা জানিই। আমার অন্তরের গভীরে কোনো না কোনো স্তরে আমি অবশ্যই জানি যে আল্লাহ সবকিছু দেখেন। অর্থাৎ কোনো না কোনো একজন আছেন, কোনো না কোনো একটি দৃষ্টি রয়েছে, যা থেকে আমি অবশ্যই গোপন নই। আমি জগতের প্রতিপালক ও রবকে অবিশ্বাস করি এবং অস্বীকার করি। আর জগতের প্রতিপালককে অস্বীকার করা মানে আমি ছাড়া আর সবকিছুকে আমি অস্বীকার করি। কিন্তু আমি যা করি, আমি যা ভাবি, এটা কেউ না জানুক, অন্তত আমি তো জানি। আর আমি যা জানি, তা কিভাবে জানি? নিজেকে পর্যবেক্ষণ ক'রে জানি। অর্থাৎ আমি নিজেই তো নিজের মধ্যে দুই ভাগে বিভক্ত। এক আমি - যে কাজ করি, আরেক আমি - যে পর্যবেক্ষণ করি। আমার নিজের মধ্যে এই যদি হয় বাস্তবতা, তাহলে আমার যিনি স্রষ্টা, আমার এই 'আমিত্বে'র যিনি স্রষ্টা, তিনি তো সবই দেখেন। আর এভাবে যদি কোনো অবিশ্বাসী সঠিক জিনিসটির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে ফেলেন, তাহলে হয়তো তখন থেকে তার অবিশ্বাসী জীবনের অবসান ঘটবে। আল্লাহ বলেছেন:

আসলে মানুষ নিজেই তার কাজ সম্বন্ধে পুরোপুরি জানে, যদিও সে নিজের দোষ-ত্রুটি গোপন করতে চায়।

(সূরা **ক্বিয়ামা**, আয়াত-১৪-১৫)

অবিশ্বাসীরা তাদের অন্তরের উৎসবিন্দুকে অস্বীকার করেছে। ফলত তারা তাদের উৎস, পরিণতি, ও ধর্ম সম্পর্কে যে সব উক্তি করে, তা

তারা যখন সৃজনশীলতার সাধনা করে, একটি কবিতা লিখতে চায়, একটি সুন্দর ছবি আঁকতে চায়, তখন তারা বিভিন্ন psychedelic drug গ্রহণ করে। তারা নেশাসক্ত হয়ে মনের উৎসবিন্দু আর তাদের মাঝামাঝি একটি পর্দা ফেলে দেয়, যে কারণে বিবেক - অর্থাৎ যে-বোধ মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অনুভূতির স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় - তাকে তারা সাময়িকভাবে ঢেকে রাখে । এবং এই বিবেকের প্রতি পূর্ণাঙ্গভাবে উদাসীন হতে পারলে তাদের অর্থেই তাদের সৃজনশীলতা পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই কথাটি অবশ্যই সত্য। তা ঘটেছে এবং ঘটেও যাচ্ছে। কিন্তু এই সৃজনশীলতা থেকে প্রাপ্ত চিন্তা বা স্বজ্ঞার (intuition) ফসল সত্যকে কতখানি, কিভাবে, কোন pattern অনুযায়ী প্রকাশ করে, বা তুলে ধরে, সে ব্যাপারে তাদের কোনো ধারণা নেই।

একেবারেই ভিত্তিহীন। তারা জগতের প্রতি এত বেশি দৃষ্টি দিয়ে ফেলেছে যে আলোর প্রতি উদাসীন হয়ে গেছে। এবং এই উদাসীনতার মর্ম ভেদ করা আরো সহজ হবে, যদি আমরা দেখি যে, এই উদাসীনতার মধ্যেই তাদের সৃজনশীলতা এবং বুদ্ধিবৃত্তি ব'লে তারা যা বুঝায় তার সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে। যেমন তারা যখন সৃজনশীলতার সাধনা করে, একটি কবিতা লিখতে চায়, একটি সুন্দর ছবি আঁকতে চায়, তখন তারা বিভিন্ন psychedelic drug গ্রহণ করে। তারা নেশাসক্ত হয়ে মনের উৎসবিন্দু আর তাদের মাঝামাঝি একটি পর্দা ফেলে দেয়, যে কারণে বিবেক - অর্থাৎ যে-বোধ মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অনুভূতির স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় - তাকে তারা সাময়িকভাবে ঢেকে রাখে । এবং এই বিবেকের প্রতি পূর্ণাঙ্গভাবে উদাসীন হতে পারলে তাদের অর্থেই তাদের সৃজনশীলতা পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই কথাটি অবশ্যই সত্য। তা ঘটেছে এবং ঘটেও যাচ্ছে। কিন্তু এই সৃজনশীলতা থেকে প্রাপ্ত চিন্তা বা স্বজ্ঞার (intui-

tion) ফসল সত্যকে কতখানি, কিভাবে, কোন pattern অনুযায়ী প্রকাশ করে, বা তুলে ধরে, সে ব্যাপারে তাদের কোনো ধারণা নেই। এবং থাকতে পারে না। বা গ'ড়েও ওঠে না। ফলে তারা শুধু চিন্তার জগতে সৃষ্টির আনন্দটুকুই অনুভব করে। এবং নিজের সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে নিজে নির্বাক, চিন্তাহীন হয়ে আত্মতৃপ্তিভরে স্ফীত হাসি দেয়।

কেউ যখন তার সন্তানকে দেখে, তখন তার আর চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না; শুধু অনুভব করলেই চলে। তেমনি তারা যখন তাদের সৃজনশীলতার সৃষ্টিগুলোর দিকে তাকায়, তখন তাদের মাথায় আর চিন্তা কাজ করে না, বরং তারা শুধু দেখেই ক্ষান্ত হয়। আর এভাবে তারা খণ্ড খণ্ড টুকরো নিয়ে পড়ে থাকে। পূর্ণাঙ্গতার প্রতি, একত্বের প্রতি, একেবারেই উদাসীন হয়ে যায়। তাই আল্লাহ্ সূরা **জারিয়াত** আয়াত ১০ এবং ১১ তে বলছেন:

> *তোমরা তো নানাবিধ মত পোষণ করছ। তা থেকে সেই মুখ ফিরায় যে সত্যভ্রষ্ট। ধ্বংস হোক ভিত্তিহীন উক্তিকারীরা, যারা মূর্খতার মধ্যে উদাসীন হয়ে রয়েছে।*

সূরা **তূর** আয়াত ১০-১৬। এখানে আল্লাহ্ কেয়ামত দিনে যে ঘটনাবলি

কেউ যখন তার সন্তানকে দেখে, তখন তার আর চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না: শুধু অনুভব করলেই চলে। তেমনি তারা যখন তাদের সৃজনশীলতার সৃষ্টিগুলোর দিকে তাকায়, তখন তাদের মাথায় আর চিন্তা কাজ করে না, বরং তারা শুধু দেখেই ক্ষান্ত হয়। আর এভাবে তারা খণ্ড খণ্ড টুকরো নিয়ে পড়ে থাকে। পূর্ণাঙ্গতার প্রতি, একত্বের প্রতি, একেবারেই উদাসীন হয়ে যায়।

ঘটবে, তার বর্ণনা করতে গিয়ে মিথ্যাচারীদের যে দুর্ভোগ হবে, তা উপস্থাপন করছেন:

এবং পর্বতমালা দ্রুত চলতে থাকবে। সেদিন বড়ই দুর্ভোগ হবে মিথ্যাবাদীদের জন্যে, যারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কাজে অনর্থকভাবে লিপ্ত থাকে, যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মেরে দোযখের আগুনের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং বলা হবে - এই সেই দোযখ যা তোমরা অবিশ্বাস করতে। এটা কি যাদু, না কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না? এতে প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর কিংবা ধৈর্য ধারণ না কর, উভয়ই তোমাদের পক্ষে সমান। তোমাদেরকে তো কেবল তারই প্রতিফল প্রদান করা হবে, যা তোমরা করতে।

একজন অবিশ্বাসী যতই জ্ঞানী হোক না কেন, সে যখন জ্ঞানার্জন করে, তখন তার নিজেরই অহংকারবৃত্তির প্রয়োজনে তা করে। এবং সে যখন সত্য-মিথ্যা নিয়ে বিশ্লেষণে রত হয়, তখন আসলে সত্যকে বিলুপ্ত করার প্রয়োজনেই তা করে। নিজের তরফ থেকে সত্য-মিথ্যা অনুসন্ধানের তাগিদ অনুভব করার কারণে নয়।

সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কাজে যারা লিপ্ত থাকে, তারা কি জানে কেন তারা তা করছে? তারা কি কোনো সত্য-মিথ্যা আবিষ্কার করার প্রয়োজনে তা করছে? নাকি নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে সত্য বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ব'লেই তা করছে? এই প্রসঙ্গটি আল্লাহ এখানে টেনে এনেছেন। এবং তারা বা তাদের মধ্যে কেউ যদি সৎ চিন্তার ধারক হয়ে থাকেন, তাহলে সত্যিকার অর্থেই বুঝতে পারবেন তারা যা অস্বীকার করছেন তা সত্য না কি মিথ্যা। চিন্তার মধ্যে এই reference তাদের খুব বেশি কাজ করে না, বরং কাজ করে এই চিন্তা যে, তাদের মনের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য যাকে অস্বীকার করা উচিৎ তাকে অস্বীকার না করলে তাদের জীবন সুখময় হয়ে উঠবে না। ফলে একজন অবিশ্বাসী যতই জ্ঞানী হোক না কেন, সে যখন জ্ঞানার্জন করে, তখন তার নিজেরই অহংকারবৃত্তির প্রয়োজনে তা করে। এবং সে যখন সত্য-মিথ্যা নিয়ে বিশ্লেষণে রত হয়, তখন আসলে সত্যকে বিলুপ্ত করার প্রয়োজনেই

তা করে। নিজের তরফ থেকে সত্য-মিথ্যা অনুসন্ধানের তাগিদ অনুভব করার কারণে নয়।

সত্যকে তারা ভালোবাসতে পারেনি বলেন যাদু বা magic, black art ইত্যাদি হিসেবে অনুমান করেছে। মজার ব্যাপার হলো, এই 'অত্যাধুনিক' যুগেও অনেক পশ্চিমা 'মহাপণ্ডিত' ইসলামকে Magic এর সাথে তুলনা করেছেন, যা বিশ্বকোষ ঘাটলেও পাওয়া যাবে। আর সেই প্রসঙ্গটি নিয়ে আল্লাহ তাদের প্রশ্ন করছেন - এটা কি যাদু না কি তোমরা দেখতে পারছ না? এই প্রশ্নটির মধ্যে একটি ইঙ্গিত রয়ে গেছে। যখন তারা তাদেরই কর্মফলের মুখোমুখি হবে তখন তারা তাদের কর্মফলকেই দেখবে। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদের প্রশ্ন করছেন - না কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না? অর্থাৎ আল্লাহ তাদেরকে তখন আবার প্রশ্ন করবেন - যে অর্থে তোমরা সত্যকে যাদু ব'লে মনে করতে, সেই অর্থেই এসব কি তোমাদেরই কর্মফল, তোমাদেরই কৃতকর্মের প্রতিচ্ছবি, না কি যাদু? নিঃসন্দেহে তারা দেখবে যে তা যাদু নয়, বরং তাই বাস্তবতা। যাদু মানে চোখের ত্রুটি, অনুভূতির ত্রুটি, কিন্তু নিজের অনুভূতি যখন দুঃখ-কষ্টে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখন সেই অনুভূতিকে ভ্রান্তি ব'লে আখ্যায়িত করা ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় না। তখন তা তার কাছে পরম সত্য আকারে দেখা দেয়। এ জন্যে আল্লাহ বলছেন - এই যন্ত্রণা, এই দোযখবাস, যদি যাদু না হয়ে থাকে, তাহলে বল সেই যাদু কই? নাকি সেই যাদুকেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ না? বরং দেখতে পাচ্ছ যে এটিই সেই সত্য। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ নতুন কোনো ফল বয়ে আনবে না। তারা তো সত্য থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল, শুধু এই জন্যে যে, কিছুদিন তারা তাদের কামনা-বাসনা এবং অর্জনের মাঝামাঝি যে সময়ের দূরত্ব, এটুকুই মেনে নিতে পারেনি। অর্থাৎ তারা ধৈর্য ধারণ করতে পারেনি। আর পরকালে যখন তাদেরই কর্মফল তাদের কাছে এসে আবির্ভূত হবে, তখন আল্লাহ বলবেন - তোমরা তো অধীর আগ্রহে এই কর্মফলের জন্যেই অপেক্ষা করেছিলে। এই ফলের ছিল দুটো রূপ - একটি ছিল আপাত অর্থে আনন্দ-সুখ যা তোমরা

সেখানেই ভোগ করেছ, আরেকটি রূপ তো সঞ্চিত রয়েছে তোমাদের অপেক্ষায়। তোমরা যখন আনন্দের জন্য অপেক্ষা করেছিলে তখন মূলত এই অদৃশ্যের জন্যই অপেক্ষা করেছিলে - নিজের অজান্তেই। সুতরাং এখন তোমরা ধৈর্য ধারণ কর কি না কর, উভয়ই সমান। এই জন্যে আল্লাহ অনেক আয়াতে বলছেন - এখন তোমরা আনন্দের সঙ্গে ভোগ কর যা তোমরা অর্জন করেছ - এইভাবে তিনি আপাত অর্থে একটি শ্লেষাত্মক কটূক্তি করেছেন। আসলে এটি শ্লেষাত্মক বা কটূক্তি নয়, যা আমাদের কাছে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে। এটি সত্য। এটি বাস্ত-বতা। অবিশ্বাসী যা কিছু তীব্রভাবে কামনা করে তা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক ভাগ সে এখানে গ্রহণ করে এবং তা গ্রহণ করার জন্য সে অতীব আগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবং আর এক ভাগ তারই জন্য অধীর আগ্রহে পরকালে অপেক্ষা করে। সুতরাং তারা যে ঔৎসুক্য নিয়ে তাদের কর্মফলের দিকে এগুচ্ছিল সেই ঔৎসুক্য নিয়ে তাদের কর্মফলই তখন তাদের দিকে এগুবে, যে কারণে আল্লাহ বলছেন - এখন তোমরা আনন্দের সঙ্গে তোমাদেরই কর্মফল ভোগ কর। অর্থাৎ তোমরা যেভাবে ধ'রে নিয়েছিলে যে তোমরা যা চাচ্ছ তা পেয়ে গেলে আনন্দের সাথেই তা ভোগ করতে পারবে, তা তো এখন তোমাদের সামনে উপস্থিত । এখন তাহলে তোমাদের সেই প্রতিশ্রুতি অর্থে আনন্দই কর।

আমাদের মধ্যে এখনও যদি অবিশ্বাসের কোনো প্রবণতা থেকে থাকে, তাহলে আমরা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রয়োগ ক'রে আরেক বার তার দিকে তাকাতে পারি এবং নিজেকে প্রশ্ন করতে পারি - আমরা কি শুধু আনন্দ চাচ্ছি? অর্থময়তা চাচ্ছি না?

প্রিয় পাঠক! আমাদের মধ্যে এখনও যদি অবিশ্বাসের কোনো প্রবণতা থেকে থাকে, তাহলে আমরা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রয়োগ ক'রে আরেক বার তার দিকে তাকাতে পারি এবং নিজেকে প্রশ্ন করতে পারি - আমরা কি শুধু আনন্দ চাচ্ছি? অর্থময়তা চাচ্ছি না? আমরা যদি আনন্দই শুধু চাই, তাহলে যা পেলে আমরা আনন্দিত হব ব'লে মনে করি, তা যদি আমাদের সার্বিক ভারসাম্যের বিচারে

সুখকর না হয়, তাহলে আমাদেরই মঙ্গলের জন্যে তা কিছুকাল লুকায়িত থাকবে। এবং যখন তা প্রকাশিত হবে, তখন সেই কর্মফলগুচ্ছ তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই আমাদের দিকে ফিরে আসবে। আমাদেরকে ছাড়া তাদের চলে না। আমাদেরকে ছাড়া আমাদের কর্মফল তো সুখী হতে পারে না, বাঁচতে পারে না, অস্তি-ত্ববান থাকতে পারে না। সুতরাং তারা তাদেরই অস্তিত্বকে সত্য প্রতিপন্ন করার জন্য আমাদেরকে চারিদিক থেকে আলিঙ্গন করবে। আমরা নিছক মনের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য যদি এগিয়ে যাই, তাহলে আমাদের কামনা-বাসনাগুলি আমাদরকে ছাড়বে না। বরং আমরা যদি সত্য-মিথ্যা উভয়কেই পাশাপাশি পর্যালোচনা করার মাধ্যমে জীবনের গূঢ় তাৎপর্য অনুসন্ধান করি, এবং সেই অনুসন্ধান যদি আমাদের অনুভূতি দ্বারা তাড়িত ও পক্ষপাতিত্ব দ্বারা ভারাক্রান্ত না হয়, তাহলে অবশ্যই আজ হোক আর কাল হোক, একদিন সত্যকে জানতে পারব। এবং তখন সত্যকে মানা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।

আমরা যদি সত্য-মিথ্যা উভয়কেই পাশাপাশি পর্যালোচনা করার মাধ্যমে জীবনের গূঢ় তাৎপর্য অনুসন্ধান করি, এবং সেই অনুসন্ধান যদি আমাদের অনুভূতি দ্বারা তাড়িত ও পক্ষপাতিত্ব দ্বারা ভারাক্রান্ত না হয়, তাহলে অবশ্যই আজ হোক আর কাল হোক, একদিন সত্যকে জানতে পারব। এবং তখন সত্যকে মানা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।

মানুষ তাই পালন করতে পারে যা সে বুঝতে পারে। আর তাই সে বুঝতে পারে যা সে সঠিক উপায়ে জানতে পারে। সুতরাং অবিশ্বাসীরা জ্ঞানের ওপর নির্ভর ক'রে যা বলে, তা সত্য নয়। কিন্তু তাদের জ্ঞান-প্রীতি - জ্ঞানকে ব্যবহার ক'রে জীবনকে একটি বিশেষ লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা - এই প্রচেষ্টার পিছনে একটি বিশাল সততা রয়েছে। সেই *উপকরণ-সংশ্লিষ্ট* (Instrumental) সততা তাদের *উদ্দেশ্যের* অসততার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। এ কারণেই ঘটে যত বিপর্যয়।

কোরআন সম্পর্কে নাস্তিকগণের খুব বেশি অভিযোগ নেই - বরং তারা শুধু কোরআনের কিছু আয়াতকে পাল্টে ফেলার পরামর্শ দেন। বর্তমানে এই বিষয়টি তাদের মধ্যে এক জাতীয় 'নৈতিক আন্দোলনে' রূপলাভ

পৃথিবীতে কেউ কি সামাজিকভাবে কোনো ব্যক্তি-লেখকের কোনো গ্রন্থের একটি বাক্যও পরিবর্তন করেছে? আমাদের জবাব হলো - না, করেনি। কোনো একটি নগণ্য লেখকের কোনো লেখাও যখন কেউ পরিবর্তন করতে চায়নি, তখন মহাগ্রন্থ কোরআনকে পরিবর্তিত করার এই ধৃষ্টতা কেন?

করেছে। বদরুদ্দীন ওমর, তসলিমা নাসরিন, প্রয়াত হুমায়ূন আযাদ প্রমুখ চিন্তাবিদগণ বারবারই এই দাবি করেছেন। শুধু বাংলাদেশের কথাই বা বলি কেন, সারা পৃথিবীতে এই নীরব বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন সদা-সক্রিয়। আমাদের প্রশ্ন হলো: পৃথিবীতে কেউ কি সামাজিকভাবে কোনো ব্যক্তি-লেখকের কোনো গ্রন্থের একটি বাক্যও পরিবর্তন করেছে? আমাদের জবাব হলো - না, করেনি। কোনো একটি নগণ্য লেখকের কোনো লেখাও যখন কেউ পরিবর্তন করতে চায়নি, তখন মহাগ্রন্থ কোরআনকে পরিবর্তিত করার এই ধৃষ্টতা কেন? আসলে, তারা যে প্রস্তাব করেন, তা নতুন কিছু নয়। বরং এই প্রস্তাব সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনেই ব'লে রেখেছেন:

> *আর যখন তেলাওয়াত করা হয় তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তখন যারা আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না তারা বলে: নিয়ে এস কোন কোরআন এটি ছাড়া অথবা একে* ***বদলে দাও****। আপনি ব'লে দিন এ আমার কাজ নয় যে, এতে আমি নিজের তরফ থেকে কোন রদবদল করব। আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি যদি আমার রবের নাফরমানি করি, তবে ভয় করি মহা দিবসের আযাবের।*

(সূরা **ইউনুস**, আয়াত ১৫)

যারা কোরআনের কথার বাইরে নতুন কোনো কথা বলতে পারে না, তারা কেন কোরআনকেই নতুনরূপে দেখতে চায়? এই কারণে কি, যে কোরআনের সামনে তাদের কাছে নিজেদেরকে ক্ষুদ্র মনে হয়? অবশ্যই তাই। যে-আমিত্বের অহংকারের এবং আত্মজাহিরির তৃষ্ণাই এখনও মেটেনি, সে-আমিত্ব সর্বভুক একত্বকে বিকর্ষণ করে। কোরআনের আলোকেই বিষয়টিকে বিবেচনা করা যাক:

যে-আমিত্বের অহংকারের এবং আত্মজাহিরির তৃষ্ণাই এখনও মেটেনি, সে-আমিত্ব সর্বভুক একত্বকে বিকর্ষণ করে।

আর আমি মূসাকে অবশ্যই কিতাব দিয়েছিলাম, তারপর তাতেও মতভেদ সৃষ্টি হল। আপনার রবের পক্ষ থেকে যদি পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যেত। তারা এ ব্যাপারে এমন সন্দেহের মধ্যে আছে যা তাদেরকে সংশয়ে ফেলে রেখেছে।

(সূরা **হূদ,** আয়াত ১১০)

*এবং আমি তাদের অন্তরের ওপর আবরণ ফেলে দেই যেন তারা তা বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে ছিপি লাগিয়ে দেই। আর যখন আপনি কোরআনে শুধু আপনার রবের **একার কথা উল্লেখ করেন**, তখন তারা ঘৃণাভরে পৃষ্ঠপ্রদর্শন ক'রে চ'লে যায়।*

(সূরা **বনী ইসরাঈল**, আয়াত ৪৬)

*আর যখন তাদের সামনে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তখন তুমি যারা কুফরী করেছে তাদের চোখে-মুখে **অসন্তোষের চিহ্ন** দেখতে পাবে। যারা তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। আপনি ব'লে দিন: তবে কি আমি তোমাদেরকে এর চেয়ে মন্দ কিছুর সংবাদ দেব? তা হল*

দোযখ। কাফেরদেরকে আল্লাহ এর ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন। আর তা অতি নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

(সূরা **আল হাজ্জ**, আয়াত ৭২)

আর আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত। কিন্তু তা জালিমদের কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।

(সূরা **বনী ইসরাঈল**, আয়াত ৮২)

এ কোরআনে আমি নানাভাবে বর্ণনা করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে; কিন্তু তাদের কেবল বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।

(সূরা **বনী ইসরাঈল**, আয়াত ৪১)

আল্লাহ বলেছেন যে তারা কখনই ঈমান আনবে না:

আর তারা আল্লাহর নামে শক্ত কসম ক'রে বলে, যদি তাদের কাছে কোনো নিদর্শন আসে, তবে অবশ্যই তারা তাতে ঈমান আনবে। আপনি বলুন: নির্দশনাবলী তো একমাত্র আল্লাহর অধিকারে। কিভাবে তোমাদের বুঝান যাবে যে, ***নিদর্শনাবলী তাদের কাছে এসে গেলেও তারা ঈমান আনবে না?***

(সূরা **আন'আম**, আয়াত ১০৯)

এবং এর কারণও তিনি ব'লে দিয়েছেন:

তারা আরও বলল: আমাদেরকে যাদু করার জন্য তুমি যত নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন আমরা কিছুতেই তোমার উপর ঈমান আনব না।

(সূরা **আ'রাফ**, আয়াত ১৩২)

অনেকে বর্তমান পৃথিবীর ধনী-দরিদ্র মেরু-প্রবণতা এবং দুর্দশা দেখে আল্লাহর দয়ালুতার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেন। উদাহরণস্বরূপ, আরজ আলী মাতব্বর সাহেব তার একটি বইতে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন - তিনি কি আসলেই দয়াময়? এর জবাব দেয়া আমার দায়িত্ব নয়, কেউ চাইলে তা কোরআন থেকেই বুঝে নিক, তবে অবিশ্বাসীরা যে এই প্রশ্ন করবে তা আল্লাহ নিজেই কোরআনে ব'লে রেখেছেন:

আর যখন কাফেররা আপনাকে দেখে তখন তারা আপনাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্ররূপে গ্রহণ করে। তারা বলে: এ কি সেই লোক, যে তোমাদের দেব-দেবীদের সমালোচনা করে? অথচ এরাই আল্লাহর জন্য 'পরম দয়াময়' উল্লেখের বিরোধিতা করে।

(সূরা **আম্বিয়া**, আয়াত ৩৬)

অবিশ্বাসীদের অনেকে সত্য প্রচার এবং তার প্রসার ঠেকানোর জন্য তার বিরুদ্ধে অর্থব্যয়ও ক'রে থাকে। আল্লাহ তাও কোরআনে ব'লে রেখেছেন:

নিশ্চয়ই যারা কাফের, তারা ব্যয় করে তাদের ধন-সম্পদ যাতে তারা নিবৃত্ত করতে পারে লোকদের আল্লাহর পথ থেকে; এখন তারা তা আরো ব্যয় করবে, তারপর তা তাদের জন্য মনস্তাপের কারণ হবে, এবং অবশেষে তারা পরাজিত হবে। আর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে জাহান্নামে সমবেত করা হবে।

(সূরা **আন্‌ফাল**, আয়াত ৩৬)

তারা আল্লাহকে না বুঝেই আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করে:

মানুষের মধ্যে কতক এমনও আছে যারা আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে না বুঝে তর্ক-বিতর্ক করে এবং প্রত্যেকে অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে।

(সূরা **আল হাজ্জ**, আয়াত ৩)

অনেকে বলে যে কোরআন সত্য, তবে তা অবিকৃত নেই। বিকৃত হয়ে গেছে। এর সপক্ষে তারা অনেক ঐতিহাসিক তথ্যাদি উপস্থাপন ক'রে। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন যে তিনি কোরআনকে নিজেই সংরক্ষণ করবেন:

আমিই স্বয়ং কোরআন নাযিল করেছি এবং আমিই স্বয়ং এর হেফাজতকারী।

(সূরা **হিজর**, আয়াত ৯)

এখন প্রশ্ন হলো: তাদের মতে, এই আয়াতটি কি বিকৃত, না কি অবিকৃত? এটি যদি অবিকৃত আয়াত হয়, তাহলে এটি কোরআন-বিকৃতির আগে ছিল এবং এখনও আছে। যেহেতু এটি আল্লাহরই বাণী, যেহেতু এ মিথ্যা হতে পারে না। সুতরাং কোরআন বিকৃত হয়নি। অর্থাৎ এরই জোরে কোরআন যে অবিকৃত তা স্বীকার করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। আর এ যদি হয় পরবর্তী সংযোজন, তাহলে কোরআন বিকৃতিকারী এই কথাটি তাতে প্রবিষ্ট করার তাগিদ কেন অনুভব করলেন? তা যতবার বিকৃত হয়েছে, ততবারই কি বিকৃতকারী এই জাতীয় একটি আয়াত তাতে প্রবেশ করিয়েছেন? তাহলে এরূপ আয়াত কতগুলি আছে? আছে কি আর? তাহলে কি কোরআনকে আংশিকভাবে মানতে হবে? এক্ষেত্রেও তো আল্লাহ বলছেন:

আর আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে আনন্দিত হয়, তবে কোনো কোনো দল এর কোনো কোনো অংশ অস্বীকার করে। আপনি বলুন: আমি তো আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি যেন আল্লাহর ইবাদত করি এবং কাউকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত না করি। আমি তাঁরই দিকে দাওয়াত দেই এবং তাঁরই কাছে আমার প্রত্যাবর্তন।

(সূরা **রা'দ**, আয়াত ৩৬)

কোরআনকে আংশিক স্বীকার করা যাবে না। এই আয়াতটি নিশ্চয়ই তথাকথিত কোরআন-বিকৃতির আগের, নয় কি? তাহলে এই আয়াতকে মানতে হলে তো স্বীকারই করা লাগে যে কোরআনে কোনো বিকৃতিই ঘটেনি। যিনি বলছেন আংশিক কোরআন মানা যাবে না, তিনি যদি জানতেন যে কোরআন বিকৃতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহলে তিনি সেই বিকৃতি সমেত সমগ্র কোরআন মানতেই বলতেন না, কারণ তাহলে বিকৃতিকে মানার দায়িত্বও বিশ্বাসীর ঘাড়ে চাপত। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে যিনি কোরআনের সবটুকুকে অবিকৃত ব'লে ধ'রে নিতে বলেছেন, তিনিই তা সংরক্ষণ করেছেন এবং করবেন। আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে কি?

তিনি যদি জানতেন যে কোরআন বিকৃতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহলে তিনি সেই বিকৃতি সমেত সমগ্র কোরআন মানতেই বলতেন না, কারণ তাহলে বিকৃতিকে মানার দায়িত্বও বিশ্বাসীর ঘাড়ে চাপত। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে যিনি কোরআনের সবটুকুকে অবিকৃত ব'লে ধ'রে নিতে বলেছেন, তিনিই তা সংরক্ষণ করেছেন এবং করবেন। আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে কি?

অনেকে ব'লে থাকে, আল্লাহ বা 'আল্লাহ' শব্দটি দ্বারা যা বুঝানো হয়, তা সত্য, তবে তাঁর তরফ থেকে কোনো গ্রন্থ আসেনি:

> *তারা চায় যে, যদি আপনি শিথিল হন, তবে তারাও শিথিল হবে।*
> (সূরা **কালাম**, আয়াত ৯)

অনেকে বলে যে আল্লাহর তরফ থেকে যে কিছু আসে বা এসেছে, এই ধারণা বিস্ময়কর এবং জাদুবৎ। তাই তা তাদের বিশ্বাসের নাগালে আসতে চায় না:

কসম সম্মানিত কোরআনের (আপনাকে আমি সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি)। কিন্তু কাফেররা এতে বিস্মিত হয়েছে যে, তাদেরই মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন সতর্ককারী এসেছেন। অতএব তারা বলতে লাগল: এ তো এক বিস্ময়কর ব্যাপার। আমরা যখন ম'রে যাব এবং মাটি হয়ে যাব, তখন কি আমরা পুনরায় জীবিত হব? এরূপ প্রত্যাবর্তন সুদূর পরাহত। আমি তো জানি মাটি তাদের কতটুকু ক্ষয় করে এবং আমার কাছে আছে লাওহে মাহ্‌ফুজ। বরং তাদের কাছে সত্য আসার পর তারা তা অস্বীকার করেছে, ফলে তারা সংশয়ে দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে।

(সূরা **কাফ**, আয়াত ১-৫)

অথচ এই একই কোরআন বিশ্বাসীর বিশ্বাস আরো বাড়িয়ে দেয়:

এবং এ কারণেও যে, যাদেরকে জ্ঞানদান করা হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এটা আপনার রবের তরফ থেকে সত্য; তারপর তারা যেন এতে ঈমান আনে এবং তাদের অন্তর যেন এর প্রতি আরও আকৃষ্ট হয়। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচলিত করেন।

(সূরা **আল হাজ্জ,** আয়াত ৫৪)